মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন?

(তথাকথিত আহলে হাদীছের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর)

উত্তর প্রদানে:
হাকীমুল ওলামা আল্লামা
মুফতী ছাঈদ আহমদ দা.বা.

প্রকাশনায়
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়
জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল,
ফেনী, বাংলাদেশ।

মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন ?

(তথাকথিত আহলে হাদীছের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর)

উত্তর প্রদানে
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফতী, পীরে কামেল, হাকীমুল ওলামা
আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ দা.বা.
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শায়খুল হাদীছ
জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল, ফেনী, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
(ফাউন্ডেশনকর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ-
রবিউস সানী, ১৪৩৫ হিজরী
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ঈসাঈ

কম্পিউটার কম্পোজ-
সোলতানিয়া কম্পিউটার
জামি'আ ইসলামিয়া সোলাতানিয়া লালপোল, ফেনী।

হাদিয়া : ১০০ টাকামাত্র

সূচিপত্র

মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন	৬
প্রথম কথা	৮
কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও কিয়াসের প্রমাণ	৯
কুরআন ও হাদীছ হলো আইন ও মূলনীতির কিতাব ও মূলোৎস	১৩
রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইজতিহাদ ও তাকলীদ	১৪
ইজতিহাদ, কিয়াস ও তাকলীদকে যারা হারাম, শিরক ইত্যাদি বলে তারা প্রকাশ্য কোরআন হাদীছ বিরোধী	১৬
ইজতিহাদ ও কিয়াসের বিরোধিতা মানে ইসলামের শত্রুদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন	১৭
ইজতিহাদে যোগ্য কারা?	১৭
তাকলীদে শাখছী	১৮
তাকলীদে শাখছীর প্রমাণ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে	১৮
তাকলীদে শাখছী:ছাহাবায়ে কেরামের যুগে	২৪
তাকলীদে শাখছী : তাবে'ঈন ও তবে তাবে'ঈনের যুগে	৩০
ইমাম আবু হানীফা রহ.এর মুকাল্লিদগণ	৩০
অন্যান্য ইমামদের ক্ষেত্রে তাকলীদে শাখছীর আরো কিছু দৃষ্টান্ত	৩৪
ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানদের আমল কিয়ামতাবধি আগতদের জন্য সনদ	৩৫
খায়রুল কুরুনের যুগেই তাকলীদে শাখছীর উপর ইজমা	৩৭
বিখ্যাত মুহাদ্দিছীনে কেরাম মাযহাবাবলম্বী ছিলেন	৩৮
শুধু চার মাযহাব কেন ?	৪১
এক সাথে একাধিক মাযহাবের অনুকরণ নাজায়েয কেন?	৪১
নফসপূজার কতিপয় নমুনা	৪২
নিজ মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে যাওয়া নাজায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ	৪৪
সবার জন্য শরী'আতের সব বিষয়ে নিজ ইমামের তাকলীদ করতে হবে কি না?	৪৫
সাধারণ মুকাল্লিদ কারা এবং তাদের করণীয় কি?	৪৬
মুজতাহিদ মুকাল্লিদগণের নিজ ইমামের সাথে মতানৈক্য:একটি সার্বজনীন উদাহরণ	৪৬
তাকলীদের ব্যাপারে বর্তমান আহলে হাদীছের দাবী এক রকম আর তাদের শীর্ষস্থানীয় আমীরদের দাবী অন্য রকম	৪৭
যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে মুক্ততাকলীদ ওয়াজিব ও ব্যক্তিতাকলীদ মুবাহ হওয়ার দাবীর অসারতা প্রমাণ	৪৯
চার মাযহাবের ইমামগণ কেন তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করলেন ?	৫২
ইমাম আবু হানীফা রহ.কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফিকাহবোর্ড:এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ	৫৩

বিশ্বে হানফী মাযহাবের বিস্ময়কর বিস্তৃতি	৫৫
আহলে হাদীছ আলেমের সাক্ষী দ্বারা হানফী মাযহাব পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত	৫৬
ভারতবর্ষে হানফী মাযহাবের প্রচার-প্রসার	৫৭
ভারতবর্ষে হানফী মুহাদ্দিছগণই হাদীছ শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা প্রচার প্রসার করেছেন	৫৭
আহলে হাদীছ নামক গাইরে মুকাল্লিদদের জন্মকথা ও উত্থান এবং তাদের নির্লজ্জ বৃটিশ পদলেহন	৫৮
'সলফী' 'আহলে-হাদীছ' দাবীর অসারতা; তাদের মুখোশোন্মোচন	৬১
আমার আহ্বান	৬২
ছাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামের সমালোচনা থেকে বিরত থাকুন	৬২
ইমামদের তাকলীদকে মূর্তিপূজারীদের তাকলীদের সাথে তুলনাকারী ও শরয়ী কিয়াসকে 'শয়তানের কাজ'আখ্যাদাতাদের দাতভাঙ্গা জবাব	৬৩
আহলে হাদীছদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ:বোখারী ও মুসলিম ইত্যাদির হাদীছ ছহীহ হওয়াটা কোন হাদীছ বা কোন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত?	৬৫
বোখারী শরীফ অধিক ছহীহ সাব্যস্ত হয়েছে ইজতিহাদী উসূল ও কড়া শর্তাবলীর আলোকে	৬৫
ছহীহ হাদীছ নির্বাচন করার ব্যাপারে ইজতিহাদী উসূল মানা আর শরী'আতের মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদী রায় না মানা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না	৬৬
সারা বিশ্বের মুসলমান হাদীছের ব্যাপারে ইমাম বোখরী রহ.এর তাকলীদে শাখছী করছে	৬৬
ইজমা শরী'আতের দলীল	৬৮
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পর ছাহাবায়ে কেরাম রা. এর পক্ষ থেকে ইজমার বিভিন্ন ঘটনা। আবু বকর রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমা	৭১
ওমর রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমাঃ	৭১
হযরত উসমান রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমা	৭২
হযরত আলী রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমা	৭৬
ইজমার একটি উসূলী পদ্ধতি	৭৮
হযরত আবু বকর রা. এর আমলে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের উপর ইজমা	৭৮
হযরত ফারূকে আ'যমের আমলে ইজমা : ১ম ইজমা : ফরয গোসল সম্পর্কে	৭৯
২য় ইজমা : এক সাথে তিন ত্বালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে	৮০
৩য় ইজমা : ২০ রাকাত তারাবীহ জামা'আতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে	৮৩
উসমান রা. এর যুগে ইজমা; ১ম ইজমা, শুধু কুরাইশী ভাষাতে কুরআন মজীদের সংকলন	৮৫
২য় ইজমা: জুমার নামাযের জন্য প্রথম আযান চালু করা	৮৭
কেয়াস শরী'আতের দলীল	৯০

কিয়াসের প্রমাণ	৯১
কিয়াস অস্বীকারকারীদের মাযহাবের বিলুপ্তি	৯২
ইমাম বোখারী রহ.এবং ইজতিহাদ ও কিয়াস	৯৪
ইমাম বোখারী রহ. এর আরেকটি ইজতিহাদ ও কিয়াসের উদাহরণ	৯৫
ইমাম বোখারী রহ. কর্তৃক অন্যান্য ইমামদের ইজতিহাদের মূল্যায়ন	৯৬
ইমাম বোখারী রহ. ও তথাকথিত আহলে হাদীছ	৯৭
তাদের অনৈতিক দাবী : একটি চমৎকার উদাহরণ	৯৭
ইমাম বোখারী রহএর রায়ের বিরুদ্ধে তথাকথিত আহলে হাদীছদের ফতোয়া	৯৮
ইমাম আবু হানীফা রহ. কিয়াসের উপর হাদীছকে প্রধান্য দিতেন (নামাযে অট্টহাসির ব্যাপারে উত্তর)	১০০
কুদূরী কিতাব সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর : বিশ্বস্ত লোকের লিখনী ও মুখনিঃসৃত বাণীগ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সনদ	১০৫
অযুতে নিয়্যতের ব্যাপারে আহলে হাদীছ মাওলানার উক্তির জবাব	১০৬
আমার সাথে আহলে হাদীছের সভাপতি ও সেক্রেটারী জনাব আব্দুল মতিন সলফী ও জনাব প্রফেসর আসাদুল্লাহ গালিবের সাক্ষাৎ ও ঐতিহাসিক ঘটনা	১১৩
তাকলীদের ব্যাপারে এ.ডি.সি জেনারেলের প্রশ্ন ও উত্তর	১১৫
ইমামে আ'যম আবু হানীফা রহ.এর অবদান	১১৭
ইমাম আবু হানীফা রহ.কে কটূক্তি করার করুণ পরিণতিৎ	১২০
এক হানফী মাওলানার প্রশ্নে এক আহলে হাদীছ আলেম লা-জবাব	১২১
তথাকথিত আহলে হাদীছের প্রতি কতিপয় প্রশ্ন	১২২
প্রকৃত আহলে হাদীছ কারা?	১২৪
প্রত্যেক মুসলমানকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে	১২৫
বর্তমান বিশ্বের গোমরাহির সেরা নায়ক ডা. জাকির নায়েক	১২৮
ডা. জাকির নায়েক বলেন, আল্লাহর কোরআনে ভুল আছে	১২৯
অযু ও পবিত্রতা ব্যতীত কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ	১৩০
মাযহাব ও মাযহাবের ইমামদের ব্যাপারে কটূক্তি	১৩২
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচিতি	১৩৪
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - এরকর্মসূচীসমূহ	১৩৫

মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন

১. শরী'আতের দৃষ্টিতে চার মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাব মানা কি?

২. তথাকথিত আহলে হাদীছের সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা জুনা আলীগড়ী তার লিখিত কিতাব 'ত্বরিকে মুহাম্মাদ এর ৫৭ পৃষ্ঠায় (লাহোরের ছাপা) লিখেছেন, মুজতাহিদ ইমাম গণের রায়, কিয়াস, ইজতিহাদ, ইস্তিম্বাত এবং তাঁদের কথাগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দুরের কথা স্বয়ং পয়গাম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যদি ওহী ছাড়া ইজতিহাদ করেন, নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন, তাও শরী'আতের দলীল নয়।

৩. আহলে হাদীছের আলেম মাওলানা আবুল হোসেন "আয্যফরুল মুবীন" কিতাবের ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তাকলীদ করা চার মাযহাবের ইমাম হোক কিংবা অন্য কারো হোক তা শিরক। তিনি ঐ কিতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, খবরদার! তোমরা কিয়াস করো না; কারণ, কিয়াস শয়তান করেছে, অর্থাৎ কিয়াস করা শয়তানের কাজ।

৪. আহলে হাদীছের নেতা ও মুখপাত্র মাওলানা জুনা আলীগড়ি তার কিতাব সিরাজে মুহাম্মাদি'র ৪৭ পৃষ্ঠায় প্রশ্নোত্তর আকারে লিখেছেন, প্রশ্ন একজন গাইরে মুকাল্লিদের পিতা হানাফী। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর গাইরে মুকাল্লিদ সন্তান

"رب اغفرلي ولوالدي"

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন" এ দু'আ করতে পারবে কি? উত্তর: হানফী মাযহাবের তাকলীদ করার কারণে তার পিতা মুশরিক হয়ে গেছে, আর মুশরিকদের জন্য দু'আ করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। তাই তার জন্য দু'আ করা যাবে না । (নাউযুবিল্লাহ)

৫. বাংলাদেশের অনেক আহলে হাদীছ মৌলভী-মাওলানাগণ কথায় কথায়, মঞ্চ, মাহফিল, টিভি চ্যানেল ও ইন্টারনেটে তাকলীদ করাকে হারাম ও বিদ'আত এবং মুকাল্লিদদেরকে বিদ'আতী বলে থাকেন। এ ব্যাপারে শরী'আতের বাস্তব ফয়সালা জানতে আগ্রহী।

৬. গাইরে মুকাল্লিদদের জনৈক মাওলানা ছাহেব (ইন্টারনেটে) বলেছেন, হানফীদের মাসআলার মূল কিতাব হলো 'কুদূরী'। ঐ কিতাবের লিখক ইমাম আহমাদ আবুল হাসান কুদূরী রহ. এর জন্ম ৩৬২ হিজরীতে। আর তিনি কুদূরী কিতাবটি লিখেছেন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মৃত্যুর ২৫০ বছর পর। ইমাম আবু হানীফাকে তিনি দেখেননি এবং তার যমানাও পাননি। অথচ ২৫০ বছর

পর তার কিতাবের প্রায় মাসআলাতে "قال أبو حنيفة" ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন" লিখেছেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে কে বর্ণনা করল, তার সনদ বা সূত্র কিছুই নেই; অথচ সনদছাড়া কোন হাদীছ গ্রহণযোগ্য হয়না। প্রশ্ন হল, হানফী মাযহাবের এই মাসআলাগুলো ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, সনদ ছাড়া তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হল?

উক্ত মাওলানা আরো বলেছেন, চার মাযহাবের ব্যাপারে ইজমা কিভাবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হল? তার কোন দলীল নেই, অথচ মুকাল্লিদগণ বলেন, ইজমা দ্বারা চার মাযহাব মানা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। উক্ত মাওলানা সাহেব আরো বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.এর প্রধান ছাত্র ও তার মুকাল্লিদ, অথচ দুইতৃতীয়াংশ মাসআলার মধ্যে তাঁরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মুকাল্লিদরা বলে থাকেন, যে ইমামের তাকলীদ করবেন তাঁর সব মাসআলাতে তাঁর তাকলীদ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, কুদূরী কিতাবে লিখা হয়েছে যে, অযুতে নিয়ত করা সুন্নাত অথচ, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنما الأعمال بالنيات

অর্থাৎ: প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেক ইবাদতে নিয়ত করা ফরয, তাই অযুতে নিয়ত করা ফরয। আমরা 'আহলে হাদীছ' উক্ত হাদীছ অনুযায়ী অযুতে নিয়ত করাকে ফরয মনে করে থাকি; কিন্তু হানফীরা উক্ত হাদীছ উপেক্ষা করে অযুতে নিয়তকে জরুরী মনে করেন না বরং সুন্নত বলেন। অপরদিকে উক্ত কিতাবে তায়াম্মুমে নিয়ত করাকে ফরয লিখেছেন, অথচ তায়াম্মুম হলো অযুর নায়েব তথা স্থলাভিষিক্ত। এখন প্রশ্ন হলো, অযুতে নিয়ত করা সুন্নত আর তায়াম্মুমে নিয়ত করাকে কেন ফরয করা হলো? এই পার্থক্যের কারণ কি? ঐ মাওলানা আরো বলেন, উক্ত কিতাবে আছে, নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে নামায ও অযু উভয়টি ভেঙ্গে যায়। অথচ অযু ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া যায়নি। উক্ত মাওলানার উক্তিগুলোর সঠিক জবাব জানতে চাই।

প্রশ্নকারী
মুহাম্মদ সালমান
ফেনী।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله وأصحابه اجمعين

প্রথম কথা

মাযহাব মানা তথা ইমামের তাকলীদ করার বিষয়টি সামান্য বিশ্লেষণযোগ্য প্রথমত: বুঝতে হবে যে, শরী'আতের সমস্ত বিধি-বিধান দুই প্রকার,

১. মানছুছ, ২. গাইরে মানছুছ।

মানছুছ অর্থাৎ কুরআনে কারীম ও হাদীছে পাকে যেগুলোর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার গাইরে মানছুছ অর্থাৎ কুরআনুল কারিম ও হাদীছ শরীফে যেসব বিধি-বিধানের স্পষ্ট বর্ণনা নেই। সেগুলোকে উসূলে শরী'আতের পরিভাষায় "ইজতেহাদী মাসায়েল"বলা হয়।

তা আবার তিন প্রকার:

১. যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন হুকুম উল্লেখ নেই। যেমন:
   (ক) মানুষের রক্ত অপারগতার ভিত্তিতে অন্য মানুষের শরীরে পুশিং করা।
   (খ) একজনের অঙ্গ অন্যের শরীরে সংযোজন করা।
   (গ) রোযার মধ্যে ইনজেকশন দেয়া।
   (ঘ) মাইকে খুতবা দেয়া, নামায পড়ানো।
   (ঙ) টেলিফোনে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।
২. যে-সমস্ত মাসআলার দলীলে সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য রয়েছে। যেমন: রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানোর মাসআলা, আমীন উচ্চৈঃস্বরে ও নিম্নস্বরে বলার মাসআলা ।
৩. যেসব মাসআলা একাধিক সম্ভাব্য অর্থসংবলিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের ব্যাপারে কুরআন মাজিদে (قروء) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যা হায়েয ও পবিত্রতা এই দুটি অর্থ বহন করে। এখন আমরা কোন অর্থ গ্রহণ করবো? এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে মুজতাহিদ ইমামের অনুকরণ করতে হবে।

আমাদের মূল দাবী হচ্ছে, "গাইরে মানছুছ" বিধানের উক্ত সকল প্রকারের ক্ষেত্রে মুজতাহিদের উপর ইজতিহাদ করা এবং ইজতিহাদে অক্ষম ব্যক্তির উপর মুজতাহিদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। এমন ইজতিহাদী মাসআলার ব্যাপারে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরেও ইজতিহাদ করা ওয়াজিব। নিম্নে দলীল পেশ করা হলো।

কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ, তাকলীদ ও কিয়াসের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿النساء: ٨٣﴾

অর্থ:"সাধারণ ছাহাবায়ে কেরামের নিকট শান্তি কিংবা শংকা সংক্রান্ত কোন খবর এসে পৌঁছলে তারা এর প্রচারে লেগে যান। অথচ বিষয়টি যদি তাঁরা রাসূল এবং (উলুল আমর) প্রসাশকদের কাছে পেশ করতেন তাহলে তাঁদের মধ্যে ইসতিম্বাত ও সূক্ষ্ম উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মুজতাহিদগণ বিষয়টির যথার্থতা উদ্ঘাটন করতে পারতেন।" (সূরা নিসা;আয়াত:৮৩)

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবু হাফছ উমর রহ. তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ আল্লুবাবে (اللباب في علوم القران) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

فَنَقُول : دلت الآيَةُ على أُمُورٍ:منها : أن في الأحْكَام ما لا يُعْرَف بالنَّصِّ ، بل بالاستِنْبَاطِ . ومنها: أنَّ الاستنباط حُجَّة ومنها : أن العَامِيّ يجب عليه تَقْلِيد العُلَمَاء في أحْكَام الحَوَادِث . ومنها : أن النَّبِي – عليه الصلاة والسلام – كان مُكَلَّفاً باستِنْبَاط الأحْكَام ؛ لأن الله – تعالى – أمَر بالرَّدِّ إلى أولي الأمْرِ ، ثم قال : (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (ولم يخصّص أولي الأمْر دون الرَّسُول ، وذلك يُوجِب الرَّسُول وأولي الأمْر كلهم مُكَلَّفُون بالاسْتِنْبَاط .

اللباب في علوم الكتاب ﴿٦ ٥٢٧٠-٥٢٦﴾

অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বেশ কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা:

১. কিয়াস (قياس) শরী'আতের দলীল ।

২. কিছু বিধান এমন রয়েছে যা নছ দ্বারা জানা যায়না বরং ইস্তেম্বাতের দ্বারা জানতে হয়।

৩. ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত তথা কোরআন-হাদীছ রিসার্চ করে শরয়ী সমাধান বের করা শরী'আতের দলীল।

৪. নবসৃষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদে অক্ষম লোকদের জন্য মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের তাকলীদ করা ওয়াজিব।

৫. রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুজতাহিদগণকে ইজতিহাদী আহকামের ব্যাপারে ইজতিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তাদের উপর ইজতিহাদ করা ওয়াজিব।

উল্লিখিত আয়াতের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা শব্দের বিভিন্নতাসহ নিম্নবর্ণিত তাফসীরের কিতাবসমূহে লিখা হয়েছে।

ক) তাফসীরে কাবীর (খণ্ড:১০, পৃ:২০০)
খ) তাফসীরে খাজেন (খণ্ড:১, পৃ:৪৭১)
গ) তাফসীরে হাক্কানী (খণ্ড:৫, পৃ:২৫)
ঘ) তাফসীরে ফাতহুল বয়ান (গাইরে মুকাল্লিদ আলেমের তাফসীর) (খ:২, পৃ:১৮৪)
ঙ) তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন (খ:২, পৃ: ৪৯৩)
চ) আহকামুল কোরআন (ইমাম জাসসাস রহ.কর্তৃক লিখিত)(২য় খণ্ড, পৃ:২১৫)

আল্লাহ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [﴿النساء : ٥٩﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসুলের। আর তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (ক্ষমতার অধিকারী) তাদের আনুগত্য কর; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তা উপস্থান কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং প্রকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯)

এই আয়াতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে উলিল আমরের আনুগত্যকেও ওয়াজিব করা হয়েছে। রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হযরত জাবের রা., হযরত মুজাহিদ রহ., হযরত আতা ইবনে আবি রাওয়াহা রহ., হযরত হাসান বসরী রহ., হযরত আতা ইবনে শায়বা রহ., হযরত আবুল আলিয়া রহ. প্রমুখের মতে উলিল আমরের অর্থ হলো "কোরআন-সুন্নাহর ইলমের অধিকারী ফকিহ ও মুজতাহিদগণ"। আর কোন কোন তাফসীর বিশারদের মতে ইসলামী সরকারের শাসকবৃন্দকে

বলা হয়েছে। উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। কারণ, ইসলামী শাসনামলে বিশেষ করে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে কেরামের শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ শাসনসমূহ ও বিচারের দায়িত্ব বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদগণের উপর অর্পণ করা হত।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ এর বরাতে মিশকাত শরীফে বিচার অধ্যায়ে ৩২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত, হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে,

عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

(أخرجه البخاري في: ٩٦ كتاب الاعتصام: ٢١ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ)

"কোন মুজতাহিদ হাকীম (বিচারক) যদি উপস্থিত ঘটনার বিচারের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করেন এবং তা সঠিক হয় তাহলে তিনি দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবেন, আর যদি অনুরূপ ইজতিহাদ করে বিচার করেন, তবে তা অশুদ্ধ হয়, তাহলে একগুণ ছাওয়াব পাবেন ।"

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফয়সালা সমস্ত মুজতাহিদগণের জন্য প্রযোজ্য।

উপরি-উক্ত আয়াতের শেষাংশে উলিল আমর তথা মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেছেন, কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে রুজু করবে অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ ও কেয়াসের মাধ্যমে সে বিষয়ে শেষ ফয়সালা প্রদান করবে।

উক্ত আয়াত দ্বারা উপস্থিত ঘটনার ব্যাপারে মুজতাহিদগনের উপর ইজতিহাদ করাকে ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। তদ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যে সমস্ত মুসলমান ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখেনা মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ মোতাবেক তাকলীদ করে আমল করা তাদের উপর ওয়াজিব। নতুবা ইজতিহাদ করার কোনো উপকারিতা অবশিষ্ট থাকেনা।

ভারতের লা-মাযহাবীদের বড় আলেম নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ছাহেবও তার প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ফতহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাতে লিখেছেন,

الظاهر أنه خطاب مستقل مستأنف موجه للمجتهدين

"এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে মুজতাহিদগণকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।"

তদ্রূপ আহকামুল কোরআন লিলজাস্‌সাস (২য় খণ্ড: ২৫৭পৃ.), তাফসীরে ইবনে কাসির (১ম খ.৬৩০ পৃ.) এবং তাফসীরে মাযহারী (উর্দূ ৩য় খ. ১৫১ পৃ.) ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে বিশদভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশাসক যদি বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদ না হন তাহলে যুগের নিত্যনতুন সমস্যার সমাধানে ও নবাবিষ্কৃত ঘটনার ব্যাপারে মুজতাহিদ ও বিজ্ঞ আলেমদের থেকে হুকুম জেনে কাজ করবেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করবেন। যদি তিনি নিজের রায় মতে কোরআন-হাদীছ বিরোধী হুকুম জারি করেন বা কাজ করেন তা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসুলে কারিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

« لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ » (مشكاة كتاب الإمارة والقضاء ص- ٣١٥)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ থেকে বরাতে মিশকাত শরীফ ৩১৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত উক্ত হাদীছ দ্বারা জানা গেলো যে, "কোন প্রশাসক যদি শরী'আতবিরোধী কোন হুকুম জারি করেন তা অনুকরণ করা জায়েয নেই।"

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয় এবং এই ধরণের আরো অনেক আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সাধারণ বে-ইলম মুসলমানরা এবং কম ইলম ও ইজতিহাদে অক্ষম মুসলমানদেরকে শরী'আতের অজানা বিষয়গুলোর ব্যাপারে বিজ্ঞ ও মুজতাহিদ আলেমদের অনুকরণ করতে হবে ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যেসব বিষয়ে তোমাদের শরয়ী মাসআলা জানা নেই, সেসব বিষয়ে ইলম ওয়ালাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে আমল করবে (সূরায়ে আম্বিয়া, আয়াত: ৭)

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জানার বিষয় দু'প্রকার ১. মানছুছ অর্থাৎ কোরআন-হাদীছে যেগুলোর হুকুম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২. গাইরে মানছুছ তথা যেসব বিষয়ের হুকুম কোরআন-হাদীছে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তাই উক্ত আয়াতের সারমর্ম হবে মানছুছ মাসআলার ব্যাপারে মুজতাহিদ, গাইরে মুজতাহিদ কিংবা যেকোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে আমল করবে। আর গাইরে মানছুছ তথা নবসৃষ্ট সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ আলেম থেকে জেনে আমল করবে। এজন্যই বর্তমানের মুফতীগণ নবসৃষ্ট মাসআলার ব্যাপারে মুজতাহিদগণের প্রণীত উসূল-মূলনীতি রিসার্চ করে সমাধান দিয়ে থাকেন।

রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشتبهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ(متفق عليه)

অর্থাৎ মেশকাত শরীফের ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বরাতে উল্লিখিত হাদীছে রাসূলে কারিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোরআন-হাদীছে হারাম ও হালালের সুস্পষ্ট তালিকা দেওয়া হয়েছে। তবে অনেক সংশয়যুক্ত জিনিষ ও অস্পষ্ট বিষয় রয়ে গিয়েছে যেগুলোর বর্ণনা কোরআন-হাদীছে স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়নি। ঐগুলোর শরয়ী হুকুম তথা জায়েয, নাজায়েযের তথ্য অনেক মানুষ জানে না ।

হাদীছের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, অনেক মানুষ জানে না অর্থ বেইলম ও ইজতিহাদে অক্ষম লোকেরা সেসব অস্পষ্ট জিনিসের ব্যাপারে শরয়ী হুকুম তথা জায়েয নাজয়েযের হুকুম জানে না। তাই সেসব বিষয়ে একমাত্র মুজতাহিদগণই ইজতিহাদ করে কোরআন-হাদীছের আলোকে শরয়ী ফয়সালা দিবেন এবং অন্য লোকেরা তাঁদের তাকলীদ ও অনুকরণ করে আমল করবেন।

মোদ্দাকথা, এ ধরণের সমস্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হলো, যেসব বিষয়ে কোরআন ও হাদিছের সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই সেসব বিষয়ে কেয়াস তথা ইজতিহাদ করে উপস্থিত সমস্যার সমাধান দেওয়া মুজতাহিদদের উপর ওয়াজিব এবং সাথে সাথে সাধারণ মুসলমান ও ইজতিহাদে অক্ষম ব্যক্তির জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। বরং ইজতিহাদ করে উপস্থিত সমস্যার সমাধান দেয়া উম্মতে মুহাম্মাদীর এক বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। কারণ ইসলাম ধর্ম সকল কাওমের জন্য, সকল স্থানের জন্য, সর্বকালের জন্য। এই জন্যই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত হাদীছের মাধ্যমে ইজতিহাদ করার প্রতি মুজতাহিদগণকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাদের ইজতিহাদ সঠিক হলে দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবেন, অন্যথায় গুনাহ তো হবেই না বরং একগুণ ছাওয়াবের অধিকারী হবেন ।

কুরআন ও হাদীছ হলো আইন ও মূলনীতির কিতাব ও মূলোৎস

ইসলাম ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম ও সার্বজনীন। কিয়ামত পর্যন্ত এমন হাজার বস্তু সৃষ্টি হবে, হাজারো সমস্যা প্রকাশ হবে, হাজারো ঘটনা সংঘটিত হবে, যে-সবের

আলোচনা ও সমাধান কুরআন ও হাদীছে স্পষ্ট শব্দে নেই। অথচ অনেক আয়াত ও হাদীছের আলোকে জানা গেছে যে, ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। মানবজাতির এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান ইসলামে নেই। তাহলে তো, এই দুটি কথা বাহ্যত সাংঘর্ষিক মনে হয়। এর সমাধান হলো, কুরআন ও হাদীছ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মানবজাতির সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারের সমস্যার সমাধানের জন্য দু'টি আইনের কিতাব ও মূলনীতির গ্রন্থ হিসেবে প্রদানকৃত। আইনের বইতে কোন ঘটনা বা ঘটনাওয়ালা ব্যক্তির নাম থাকে না, বরং বাদী-বিবাদীর মাধ্যমে কোন ঘটনা কোর্টে উপস্থাপিত হলে উকিলগণ আইন বিচার-বিশ্লেষণ করে হাকিমের সামনে পেশ করে বলেন, উক্ত ঘটনা আইন বইয়ের এত নং ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । অতএব, উক্ত ঘটনার ব্যাপারে রায় আমার মুআক্কিলের পক্ষে থাকবে। তদ্রূপ যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে বা যে কোন নতুন সৃষ্ট সমস্যা ও নবাবিষ্কৃত বস্তুর ক্ষেত্রে শরয়ী ফয়সালা মানতে চাইলে শরী'আতের উকিল তথা মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হতে হবে। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ মুসলমানদের উপর মুজতাহিদদের অনুকরণ করা ওয়াজিব এবং আইনের কিতাব কোরআন-হাদীছের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে উপস্থিত সমস্যার সমাধান দেয়া মুজতাহিদগণের উপর ওয়াজিব ও একান্ত কর্তব্য। এমনকি যেসব ব্যাপারে ওহী আসেনি, সেসব ব্যাপারে স্বয়ং সাইয়েদুল মুজতাহিদিন রাসূলে কারিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও ইজতিহাদ করা ওয়াজিব।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইজতিহাদ ও তাকলীদ

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজতিহাদের চর্চা শুরু হয়। রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেছেন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তার দু'টি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো,

১. বোখারী শরীফের ২খ. ৫৯১ পৃ. কিতাবুল মাগাযিতে রয়েছে, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গাযওয়ায়ে আহযাব শুভসমাপ্তি ঘটান তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইয়াহুদী বংশ বনু কুরাইযাকে

মদীনা থেকে দেশান্তরিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। তৎক্ষণাৎ রাসুলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা বনু কুরাইযায় গিয়ে আছরের নামায পড়বে। ছাহাবায়ে কেরাম হুযুরের হুকুম পালনার্থে রাওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আছরের সময় প্রায় শেষ হওয়ার উপক্রম। তখন ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কিছু ছাহাবা নিজ বিচার-বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদের আলোকে প্রস্তাব করেন যে, বনু কুরাইযার উপকণ্ঠে গিয়ে আছরের নামায পড়া রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য নয়। বরং রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, তাড়াতাড়ি যাওয়া। তাই আমরা নামায এখানেই পড়ে নিবো যাতে আছরের নামায কাযা হয়ে না যায়। অনেকে সেখানেই পড়ে নিলেন। অপর দিকে আর একদল ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেখানে গিয়ে নামায পড়ার জন্য বলেছেন, তাই সময় থাকুক আর নেই থাকুক আমরা সেখানে গিয়েই নামায পড়বো। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে ছাহাবায়ে কেরামের একাংশ সেখানে গিয়ে আছরের নামায আদায় করলেন। পরে উভয় দলের এই ইজতিহাদী আমল নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পেশ করা হয়। রাসুলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দলকে খারাপ বলা তো দূরের কথা, বরং উভয় দলের কাজের উপর পূর্ণ সমর্থন দেন এবং সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন।

উক্ত ঘটনা দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা মুজতাহিদ তাঁদের ইজতিহাদ সাব্যস্ত হলো। আর যাঁরা মুজতাহিদ নন তাঁদের তাকলীদ সাব্যস্ত হলো। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ইজতিহাদ ও তাকলীদ উভয়টির স্বীকৃতি সাব্যস্ত হলো।

২. ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে হত্যা করা হবে, না মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে এই বিষয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ছাহাবায়ে কেরাম নিজস্ব ইজতিহাদের আলোকে দু'ধরণের মতামত পেশ করেন। হযরত আবু বকর রা. নিজের মত প্রকাশ করেন যে, তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলে ভালো হবে। কারণ, হতে পারে ভবিষ্যতে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তাছাড়া বর্তমানে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থাও দুর্বল। মুক্তিপণ

নিলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হতে পারে। অপর দিকে হযরত উমর রা. রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিজের ইজতিহাদী রায় প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, আমার মতে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া না হোক, বরং তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ মুসলমান আত্মীয়দের হাতে হত্যা করা হোক। যাতে শিরক ও কুফুরীর মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং সারা দুনিয়ার সামনে এই কথা প্রকাশ হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার মহাব্বত দুনিয়ার সকল মানুষ, সম্পদ ও আত্মীয়তার মহাব্বত থেকে অনেক বেশী। অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম আবু বকর রা. এর মতের সাথে ঐকমত্যপোষণ করলেন। অপর দিকে হযরত উমর রা. এর পক্ষে শুধু হযরত সা'আদ রা. ছিলেন। দয়াল নবী রাহমাতুললিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে দয়ার প্রভাব অধিক হওয়ার কারণে নিজস্ব ইজতিহাদী রায় মতে হযরত আবু বকর রা. ও তাঁর সহমতপোষণকারীদের রায়কে পছন্দ করলেন। সে অনুসারে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিলেন। অতঃপর মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো।

মোদ্দাকথা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এধরনের ইজতিহাদের অনেক ঘটনা ঘটেছে। উদহারণস্বরূপ এখানে সংক্ষেপে উক্ত দু'টি ঘটনা পেশ করা হলো। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই প্রয়োজনের ভিত্তিতে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন তাদের মধ্যে ইজতিহাদের প্রথা চালু ছিলো এবং স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ করতেন। উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহ দ্বারা এ কথাই সাব্যস্ত হলো যে, যে বিষয়ে ইজতিহাদ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে মুজতাহিদগণের উপর ইজতিহাদ করা ওয়াজিব এবং যারা ইজতিহাদে অক্ষম তাদের জন্য মুজতাহিদদের ইজতিহাদ মতে তাকলীদ করে আমল করা ওয়াজিব।

ইজতিহাদ, কিয়াস ও তাকলীদকে যারা হারাম, শিরক ইত্যাদি বলে তারা প্রকাশ্য কোরআন হাদীছ বিরোধী

কোরআন মাজীদের উল্লিখিত অকাট্য আয়াতে কারীমা এবং ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, গাইরে মানছুছ মাসআলাসমূহের ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদ করে শরয়ী ফয়সালা দেয়া মুজতাহিদগণের উপর ওয়াজিব। স্বয়ং

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরেও ওয়াজিব এবং যারা ইজতিহাদে অক্ষম তাদের উপর মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা ওয়াজিব। তাই যারা ইজতিহাদকে হারাম ও শয়তানী কাজ এবং তাকলীদকে শিরক, হারাম ও বিদ'আত ইত্যাদি বলে তারা প্রকাশ্য কোরআন-হাদীছ বিরোধী।

ইজতিহাদ ও কিয়াসের বিরোধিতা মানে ইসলামের শত্রুদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন

ইসলাম হচ্ছে সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বস্থানে প্রযোজ্য আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। তবে নবপ্রকাশিত ঘটনাবলী ও নবসৃষ্ট সমস্যাবলীর ব্যাপারে কোরআন-হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা নেই। ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমেই ঐগুলোর সমাধান দেয়া ওয়াজিব। যা উপরে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইজতিহাদ ও তাকলীদের রাস্তা বন্ধ করে ইসলামের সার্বজনীনতার বিলুপ্তি সাধন করে সংকীর্ণ করা ইসলামের শত্রুদের প্রধান এজেণ্ডা। আর গাইরে মুকাল্লিদরা ইজতিহাদ, কিয়াস ও তাকলীদের বিরোধিতা করে সেই এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। (না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক)

ইজতিহাদে যোগ্য কারা?

ইজতিহাদী শক্তি আল্লাহপ্রদত্ত এক বাতেনী শক্তি। উক্ত শক্তি আল্লাহ পাক ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন, তবে-তাবেঈনদের যুগেও হাজারে দু'চার জনকে দান করেছিলেন। তাছাড়া ইজতিহাদ করার জন্য মুজতাহিদ ব্যক্তিকে কোরআন-হাদীছের ব্যাপারে পারদর্শী হতে হবে। তথা কোরআন মাজীদের সমস্ত আয়াতের বিশেষকরে আহকামের আয়াতগুলোর ছহীহ অর্থ ও তাফসীরের ব্যাপারে তার পূর্ণ ইলম থাকতে হবে। সম্ভাব্য সকল বিষয়ের হাদীছসমূহ তার জানা থাকতে হবে। হাদীছে ছহীহ, হাদীছে হাসান, হাদীছে য'য়ীফ, হাদীছে মা'লুল ইত্যাদি বুঝার ব্যাপারে তার গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। আয়াত ও হাদীছসমূহের নাসেখ, মানসূখ (রহিতকারী, রহিত) এর পুরোপুরি ইলম থাকতে হবে। সাংঘর্ষিক আয়াতে কারীমা ও হাদীছগুলোর ব্যাপারে তাতবীক ও সামঞ্জস্যসাধনের পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কোরআন-হাদীছ যেহেতু আরবী ভাষায় তাই আরবী ভাষাতে পূর্ণ দক্ষ হতে হবে। স্থান কাল, ব্যক্তি ও পরিবেশের ব্যাপারে তার পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তার ইজতিহাদ

খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন, তবেতাবেঈন ও চার ইমামের ইজমা বিরোধী হতে পারবে না। এমন আয়াতে কারীমা ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হতে পারবে না যেগুলোর হুকুম রহিত হয়নি বরং দ্ব্যর্থহীন ও যথাযথভাবে চালু আছে।

বর্তমান এক বড় ফিতনা শুরু হয়েছে যে, কিছু নতুন জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা কিংবা উর্দূ ভাষায় কোরআন মাজিদের তারজমা, অনুবাদ ও তাফসীর দেখে এবং বোখারী-মুসলিম ইত্যাদি হাদীছের কিতাবসমূহের অনুবাদ দেখে ইজতিহাদ শুরু করে দিয়েছে। ইমামগণের শানে ও তাঁদের মাযহাবের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলে এবং তাঁদের সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে। অথচ সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম আরবী ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে হাজারে দশজনও ইজতিহাদ করতে সাহস করতেন না। সুতরাং ঐ-সব ফিতনাবাজ প্রতারকদের ব্যাপারে মুসলমান ভাইদের সাবধান থাকতে হবে। তারা জাতির মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী মুখোশপরা শয়তান এবং তারা মুসলমানদের শত্রু।

তাকলীদে শাখছী

তাকলীদে শাখছী (ব্যক্তিতাকলীদ) অর্থাৎ একক ব্যক্তির তাকলীদ করা তথা দলীল তলব না করে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে অনুকরণ করা। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন ও তবে তাবে'ঈনের যুগে উক্ত তাকলীদ শাখছী অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

তাকলীদে শাখছীর প্রমাণ রাসুল সা.এর যুগে

১. বোখারী শরীফের ২য় খ. ৯৯৭ পৃষ্ঠায় হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের পূর্বে দশম হিজরীতে হযরত মু'আয রা. কে ইয়ামনবাসীর জন্য মু'আল্লিম ও আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ বলেন, তিনি আসার পর আমরা তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম এক ব্যক্তি মারা গিয়েছে, তার এক মেয়ে ও এক বোন জীবিত আছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে তার মিরাছ কিভাবে বণ্টন করা হবে? তখন তিনি ফয়সালা দিলেন, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মেয়ে পাবে অর্ধেক, বোন পাবে অর্ধেক। মুসলমানরা হযরত মু'আয রা. এর এই

ফয়সালা মেনে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে কোন দলীল চান নি। এটাকে বলা হয় তাকলীদে শাখছী অর্থাৎ দলীল চাওয়া ব্যতীত মুজতাহিদের কথা মেনে নেওয়া। রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয রা.কে ইয়ামন বাসীর জন্য মু'আল্লিম ও আমির নিযুক্ত করে পাঠানো দ্বারা স্পষ্টভাবে একথাই সাব্যস্ত হলো যে, হযরত মু'আয রা. শরী'আতের যাবতীয় আহকাম ও সমস্যায় যে সমাধানই দিতেন ইয়েমেনবাসী তা একবাক্যে মেনে নিতেন; নিজেদের উপর ওয়াজিব মনে করে আমল করতেন। এটাকেই বলা হয় তাকলীদে শাখছী।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয রাযি. কে ইয়ামনের আমীর বানিয়ে পাঠানোর যখন মনস্থ করলেন তখন হযরত মু'আয রা.কে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট যদি কোন শরয়ী সমস্যা উপস্থিত হয় তাহলে তার ফয়সালা কিভাবে দিবে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাবের দ্বারা ফয়সালা দিব। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কিতাবে যদি তার ফয়সালা না পাও তাহলে কি করবে? তখন তিনি বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত অনুযায়ী আমি ফয়সালা দিব। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি রাসূলুল্লাহর সুন্নাতে তা না পাও তখন? তিনি বললেন, আমার রায় মতে ইজতিহাদ করে ফয়সালা দিব এবং ঐব্যাপারে ইজতিহাদ করতে কোনপ্রকারের অবহেলা করবো না। একথার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হাত মোবারক রেখে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি রাসূলের রাসূল তথা তাঁর প্রতিনিধিকে এমন কাজের জন্য তাওফীক দান করেছেন যা দ্বারা তার রাসূল সন্তুষ্ট। উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা কয়েকটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায়,

১. ইজতিহাদ ও কেয়াস শরী'আতের দলীল ।
২. যেসব বিষয়ে কোরআন ও হাদীছে স্পষ্ট আলোচনা নেই ঐসব বিষয়ে মুজতাহিদদের জন্য ইজতিহাদ করা জরুরি।
৩. মুজতাহিদ নিজের ইজতিহাদ মতে ফয়সালা দেয়ার পর ইজতিহাদে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য তার তাকলীদ করা তথা তার অনুকরণ করে আমল করা ওয়াজিব।

৪. শরী'আতের যাবতীয় ব্যাপারে হযরত মু'আয রাযি. কে জিজ্ঞাসা করে তাঁর ফয়সালা মতে আমল করা ইয়ামনবাসীদের উপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অতঃপর ইয়ামনবাসী কোনো প্রকারের দলীল তলব করা ব্যতীত মু'আয রা. এর অনুকরণ করে আমল করেছেন। এটাকে বলা হয় তাকলীদে শাখছী।

৫. উল্লিখিত সববিষয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম ও অনুমতিক্রমে সাব্যস্ত হয়েছে।

৬. মুজতাহিদ ব্যক্তি ইজতিহাদের ইচ্ছা করার কারণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দু'আ দিয়েছেন। তা দ্বারা প্রমাণিত হয় সমস্ত মুজতাহিদীনে কেরাম নবীজীর উক্ত দু'আয় শামেল।

উক্ত হাদীছটি হাদীছের অনেক প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, সুনানে বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে দারমী, আল মুসনাদুল জামে', ই'লামুল মুকি'য়ীন ।

তবে উক্ত হাদীছের ব্যাপারে কোন কোন ব্যক্তি বলেছেন, উক্ত হাদীছটি হযরত শো'বা রহ. রেওয়ায়েত করেছেন আবু 'আউন রহ. থেকে, তিনি রেওয়ায়েত করেছেন হারেছ বিন আমের রহ. থেকে, তিনি মু'আয রা. এর কয়েকজন শাগরিদ থেকে। তবে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইলমে হাদীছের পরিভাষায় সনদের মধ্যে এধরনের রাবীকে মাজহুল তথা অপরিচিত অজ্ঞাত রাবী বলা হয়। ইলমে হাদীছের কায়দা অনুযায়ী মাজহুল রাবীর রেওয়ায়েত জ'য়ীফ তথা দুর্বল। তাই উক্ত হাদীছটি দুর্বল।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাব ই'লামুল মূকি'য়ীন খ. ১, ২০২ পৃষ্ঠায় উক্ত অভিযোগের উত্তরে বলেছেন, হারেছ বিন আমের রহ. (তাবে'ঈ) হযরত মু'আয রা. এর অনেক শাগরিদ থেকে উক্ত হাদীছটি রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁরা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হওয়ার কারণে তাঁদের নাম উল্লেখ করেন নি। ইতিহাস সাক্ষী মু'আয রা. এর শাগরিদগণ ইলমে-আমলে ও তাকওয়ায় ও সততায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মিথ্যুক বা মিথ্যায় অভিযুক্ত অথবা রেওয়ায়েতের ব্যাপারে দুর্বল ছিলেন না। তাদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে কোন মুহাদ্দিছ কখনো সন্দেহ পোষণ করেন নি। তদুপরি উক্ত হাদীছের সবচেয়ে বড় সনদ বহনকারী হলেন আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম শো'বা রহ.। যার ব্যাপারে কোনো কোনো হাদীছের ইমাম বলেছেন, যদি কোনো হাদীছের সনদে শো'বা রহ. কে দেখ তাহলে তা

নিঃসন্দেহে গ্রহণ করে নাও। তাছাড়া শায়খ আবু বকর খতীব বলেছেন, কারো কারো রেওয়ায়েত মতে দেখা যায়, উক্ত হাদীছটি ওবাদা বিন নাসি রহ. হযরত মু'আয রা. এর শাগরিদ আব্দুর রহমান বিন গানম থেকে তিনি হযরত মু'আয রা. থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তাই হাদীছটি সনদে মুত্তাসিল ও পরিচিত রাবির মাধ্যমে বর্ণিত হওয়টা সাব্যস্ত। এ ছাড়া উক্ত হাদীছকে উম্মতের সমস্ত বড় বড় মুহাদ্দিছীনে কেরাম ও মুজতাহিদীনে কেরাম রেওয়ায়েত করেছেন এবং দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইলমে হাদীছের একটি মূলনীতি হলো, কোন দুর্বল হাদীছকেও যদি উম্মতের আহলে ইলমগণ রেওয়ায়েত করেন এবং ইলম, আমল ও দলীলের জন্য গ্রহণ করেন সেটার ব্যাপারে দুর্বলতা ও সন্দেহ থাকে না। সেটা ছহীহ হাদীছ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, মু'আয রা. এর হাদীছটি সকল ব্যাপারে ইলমী বিবেচনানুযায়ী সন্দেহাতীতভাবে ছহীহ সাব্যস্ত হলো। (ই'লামুল মূকি'য়ীন খ. ১ পৃ. ২০২)

২. বোখারী শরীফ ১ম খ.৫১৬ পৃ.; মুসলিম শরীফ ২য় খ. ২৭৩ পৃ.; মিশকাত শরিফ ২য় খ. ৫৫৫ পৃ. তে হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ইম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থাবস্থায় এক মহিলা ছাহাবীয়া তাঁর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন নয় পরে আসিও। তখন মহিলাটি আরয করলেন, যদি পরে এসে আপনাকে না পাই; আপনি এই ধরা থেকে বিদায় নিয়ে যান, তাহলে সমাধানের জন্য কার নিকট যাবো? হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিউত্তরে বললেন, আমার অবর্তমানে আবু বকরের নিকট গমন করবে। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই কথা বলেননি যে, আমার পরে যে কোনো ছাহাবীর নিকট যাবে । বরং আবু বকর ছিদ্দীক রা. কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন । যেমনিভাবে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উক্ত হুকুম দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাঁর পরে খলিফা হবেন আবু বকর রা., তেমনিভাবে তা দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর ছাহাবায়ে কেরামকে একমাত্র হযরত আবু বকর রা. এর অনুকরণ তথা তাঁর তাকলীদ করতে হবে। এটাকেই বলা হয় তাকলীদে শাখছী তথা একক ব্যক্তির অনুকরণ করা ।

৩. বোখারী শরীফ, মুসলিস শরীফে বরাতে মিশকাত শরীফ ১০১ পৃষ্ঠায় ইমামত অধ্যায়ে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁর অসুস্থতা খুবই বেড়ে গিয়েছিলো এবং মাসজিদে যেতে পারছিলেন না, অন্য দিকে হযরত বিলাল রা. বারংবার হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের সময় ঘনিয়ে আসার কথা অবগত করছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আবু বকর রা. কে বল নামায পড়িয়ে দিতে। তখন হযরত আবু বকর রা. লাগাতার কয়েকদিন অর্থাৎ ১৭ ওয়াক্ত পড়ালেন। এই হাদীছটি বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যখন হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. কে ইমামতি করার জন্য বলছেন, তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. ও হাফছা রা. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর নরম দিলের মানুষ, আপনার ইমামতির স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে গেলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন; নামায পড়াতে পারবেন না। উমর রা.কে নামায পড়াতে হুকুম করলে ভালো হয়। এই কথাটি তাঁরা বারবার আরয করলেন। কিন্তু রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অসুস্থতা সত্ত্বেও অত্যন্ত কড়া ভাষায় তাদের এই আরযকে প্রত্যাখান করলেন এবং তিনি নিজের হুকুমের উপর অটল ছিলেন। হুকুম করলেন, আবু বকরকেই নামায পড়াতে বল। আর হযরত আবু বকর রা. হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যু পর্যন্ত নামাযের ইমামতি করেছেন।

উক্ত ঘটনার মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে হযরত আবু বকর রা. খলিফা নিযুক্ত হবেন। সাথে সাথে এই কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইবাদত, খেলাফত, সিয়াসত তথা দ্বীনের সকল শাখার গাইরে মানছুছ (অস্পষ্ট) মাসআলাসমূহের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রা.এর তাকলীদ করতে হবে। এটাকে বলা হয় তাকলীদে শাখছী।

৪. ৮ম হিজরীতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলহিহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে 'আছ রা. কে গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল নামক যুদ্ধে ৩০০ সৈন্যের আমির বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যের জন্য পরে হযরত আবু উবাইদা রা. এর নেতৃত্বে ২০০ সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। উক্ত যুদ্ধে মুসলমানরা বিরাট বিজয় অর্জন করেছিলেন। ঐ সফর অবস্থায় এক রাতে হযরত আমর ইবনে আছ রা. এর ইহতেলাম (স্বপ্নদোষ) হয়েছিলো; তিনি

তায়াম্মুম করে নামাযের ইমামতি করেন। কিছু কিছু সাথী এই বিষয়ে আপত্তি জানালে, তিনি প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর কালাম থেকে এই আয়াত পড়ে শুনান;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। তথা এমন কাজ করবে না যার দ্বারা জীবন বিপন্ন হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী অথবা জীবননাশের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসীম দয়ালু। (সূরা নিসা, আয়াত:২৯)

তিনি উক্ত আয়াত থেকে ইজতিহাদ করে নিজের অবস্থার ব্যাপারে শরয়ী রায় কায়েম করেছেন যে, আমার এই অবস্থায় গোসল করা যাবে না, বরং আমাকে তায়াম্মুম করতে হবে। তাই তিনি তায়াম্মুম করেছেন এবং ঐ তায়াম্মুমের ভিত্তিতে ইমামতি করেছেন। তার সাথী ছাহাবায়ে কেরাম ঐ ব্যাপারে তার তাকলীদ করেছেন এবং তার পিছনে নামায পড়েছেন। সফর থেকে আসার পর উক্ত ঘটনা রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে পেশ করা হলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে আছ রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি নাপাকী অবস্থায় সাথীদের নামাযের ইমামতি করেছো? তখন তিনি নিজের অবস্থা বয়ান করলেন এবং উল্লিখিত আয়াতে কারীমা পড়ে বললেন; আমি উক্ত আয়াতের আলোকে প্রচণ্ড শীতের অবস্থায় গোসল করাকে আমার জন্য বিপজ্জনক মনে করে, গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়িয়েছি। তখন হুযুর ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন এবং ঐ ব্যাপারে তাঁকে দোষারূপ করলেন না, বরং তার কাজকে সন্তুষ্টচিত্তে সমর্থন করলেন ।

উক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুজতাহিদ ছাহাবায়ে কেরাম যেখানে ইজতিহাদের প্রয়োজন, সেখানে কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করতেন। আরও সাব্যস্ত হলো যে, যারা ইজতিহাদে অক্ষম তারা ইজতিহাদে সক্ষমদের ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করতেন। সাথে সাথে প্রচণ্ড শীতের সময় গোসল করাকে আত্মহত্যার উপর কিয়াস করে উল্লিখিত কাজ করা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে যেখানে আমীর বানিয়ে পাঠাতেন, তিনি ইজতিহাদী মাসায়েলে, ইজতিহাদ করে রায় কায়েম করতেন; অতঃপর সমস্ত সাথীগণ তাঁর তাকলীদ করতেন। আর এটাকেই বলা হয় তাকলীদে শাখছী; অর্থাৎ দলীল বুঝে না আসলেও এক

ব্যক্তির অনুকরণ করে কাজ করা। আর এই ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পরিষ্কার অনুমোদন পাওয়া গেলো। (ইমাম বোখারী রহ. বোখারী শরীফের ১ম খ. তায়াম্মুম অধ্যায়ে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেন। বিদায়া-নিহায়া ৪র্থ খ. ২৭৩ পৃ.তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

তাকলীদে শাখছী:ছাহাবায়ে কেরামের যুগে

১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ.কর্তৃক লিখিত শরহে শামায়েল ২য় খ. ২১৯ পৃষ্ঠায় নাসাঈ শরীফ, মুসনাদে আবু ইয়া'লা, মুসতাদরাকে হাকেম ইত্যাদি কিতাব থেকে ছহীহ সনদে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে যখন আনছারী ছাহাবাগণ মুহাজের ছাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, এক আমির আমাদের পক্ষ থেকে হবে আরেক আমির আপনাদের পক্ষ থেকে হবে। তখন হযরত উমর রা. আনছারদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আপনারাও জানেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. কে মুসলমানদের নামাযের ইমামতি করার হুকুম দিয়েছিলেন এবং ইমাম বানিয়েছিলেন। এখন আপনাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি এমন আছেন কি যিনি আবু বকর ছিদ্দীক রা. এর উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজ বা অন্যের জন্য ইমামতি কিংবা আমির হওয়াকে পছন্দ করবেন তথা অগ্রাধিকার দিবেন? তখন আনছারী ছাহাবাগন একবাক্যে বলে উঠলেন,

نعوذ بالله أن نتقدم علي أبي بكر

অর্থাৎ আবু বকর রা.এর উপর নিজেদেরকে খেলাফতের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই!

হযরত উমর ফারুক রা. কোরআন হাদীছের আলোকে খেলাফতের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রা. এর আরো কয়েকটি অগ্রাধিকারের কারণ ও তাঁর ফযীলত বয়ান করেছেন এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা. এর নিকট বায়'আত হওয়ার দরখাস্ত করেছেন, অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রা. নিজে খলীফা হতে অস্বীকার করে উপস্থিত মুহাজের ও আনছারী ছাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা হযরত উমর রা. অথবা আবু উবাইদার হাতে বায়'আত হোন। তখন তাঁরা উভয়ই একবাক্যে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আপনার জীবদ্দশায় আমরা খেলাফতের যিম্মাদারী নিব তা অসম্ভব। আপনি সব মুহাজেরদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। নামায

ইসলামের প্রধান রোকন; ঐ নামায কায়েম করার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আপনাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এই জন্য আপনিই খেলাফতের যোগ্য। অতঃপর হযরত উমর রা. ও হযরত আবু উবাইদা রা. হযরত আবু বকর রা. এর হাতে বায়'আত হওয়ার জন্য আপন হাতদ্বয় প্রসারিত করে বায়'আত হোন। সাথে সাথে উপস্থিত মুহাজের ও আনছারী ছাহাবাগণ হযরত আবু বকর রা. এর হাতে বায়'আত হয়ে গেলেন। এটাকে 'বায়'আতে ছকিফা' বলা হয় ।এটি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের দিন তথা ১১ হি. রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ, সোমবার বিকেলের ঘটনা। তার পরের দিন মঙ্গলবার হযরত উমর রা. বারবার অনুরোধ করাতে হযরত আবু বকর রা. মাসজিদে নববীর মিম্বারে বসেছিলেন। অতঃপর ব্যাপকভাবে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রা.এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।

(বিদায়া ও নেহায়া ৫ম খ.২৪৮পৃ.)

মোদ্দাকথা, হযরত আবু বকর রা. কে তাঁর অনেক ফযীলতের কারণে বিশেষ করে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখেরী হায়াতে তাঁকে মুসলমানদের জন্য ইমাম নির্ধারণ করে যাওয়াতে ছাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্যের সাথে তাঁর হাতে বাই'আত হয়ে খলীফা নির্বাচন করেন। দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে সকল বিষয়ে তাঁদেরকে পরিচালনার জন্যে তাঁকে ইমাম ও আমীর নির্বাচন করেন এবং সকল ব্যাপারে তাঁর অনুকরণ করার দৃঢ় শপথ করেন। আর এটাই হলো তাকলীদে শাখছী তথা ব্যক্তি অনুকরণ। আর এইভাবেই রচিত হলো খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তাকলীদে শাখছীর প্রথম ভিত্তি।

অপর দিকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীছে বলেছেন, প্রথম যে খলীফার হাতে বাই'আত হবে সে খলীফার হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে এবং তার অনুকরণ করবে। ঐকমত্যে বাই'আত হওয়ার মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের পর যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি খেলাফতের দাবি তুলে তবে তাকে হত্যা করা হবে ।

(বোখারী-মুসলিম ও মিশকাত শরীফ, কিতাবুল জুমু'আ ৩২০ পৃ)

উল্লেখ্য যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর ছাহাবায়ে কেরামের প্রথম মৌলিক ও বৃহত্তম কাজ ছিলো, খলীফা নির্বাচন করা। আর এই কাজটা অস্তিত্ব লাভ করলো কিয়াসের ভিত্তিতে। কারণ, কোরআন-হাদীছের কোনো স্পষ্ট বাণীতে হযরত আবু বকর রা.কে নবীজীর

খলীফা নির্বাচন করার কথা উল্লেখ ছিলো না। হযরত উমর রা. এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা. এর বিভিন্ন ফযীলতের বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষ করে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. কে তাঁর শেষবয়সে ইসলামের সবচেয়ে উত্তম ইবাদত নামাযের জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার কারণে, ইসলামের অন্যান্য সবশাখার ব্যাপারে তাঁর খলীফা তথা স্থলাভিষিক্ত হওয়াটা আরো উত্তমরূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়। হযরত উমর রা.তাঁর বক্তব্যে একথা তুলে ধরার পর উপস্থিত মুহাজির ও আনছারী ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর উক্ত কেয়াসকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করে নেন এবং ঐ ভিত্তিতে হযরত আবু বকর রা.এর খেলাফতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান; অতঃপর তাঁর হাতে বাই'য়াত হোন। উক্ত ঘটনা দ্বারা সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কিয়াস ইসলামের দলীল। আর ঐ কিয়াসের ভিত্তিতেই হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো।

২. বোখারী শরীফ, কিতাবুয যাকাত ১৮৮ পৃষ্ঠায়, মুসলিম শরীফ কিতাবুল ঈমান, ফাতহুল মুলহিম ১৯০ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যখন আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হলেন, কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেলো, আর কিছুলোক যাকাত দিতে অস্বীকার করল, তখন আবু বকর রা. তাদের সাথে জিহাদ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। হযরত উমর রা. এতে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন, যারা কালিমা পড়েছে তাদের সাথে আপনি কিভাবে জিহাদ করবেন? অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম করা হয়েছে মানুষের সাথে জিহাদ করতে, যতক্ষণ পর্যন্ত কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি না দেয়, অর্থাৎ আমাকে নবী বিশ্বাস করে আমার দা'ওয়াতের ভিত্তিতে এই কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে এই স্বীকৃতি দিবে তারা আমার পক্ষ হতে তথা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জান-মালের নিরাপত্তা পাবে। তাদের জান-মালের উপর রাষ্ট্রের পক্ষ হতে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। হ্যাঁ যদি সে এমন কোন ধরণের কাজ করে বসে যার কারণে ইসলামী আইনে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। যেমন, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করে বা চুরি করে তাহলে তার পাপ অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সে কালিমা পড়ার পর তার অন্তর প্রকৃত ঈমানদার

হলো নাকি হলো না তার হিসাব একমাত্র আল্লাহর কাছে থাকবে। হযরত উমর রা. এর আপত্তির পর হযরত আবু বকর রা. বললেন, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবো। কারণ নামায হল, শরীরের হক; আর যাকাত হল মালের হক। হাদীছের ব্যাখ্যাকারীরা বলেছেন, আবু বকর ছিদ্দীক রা. যাকাতকে নামাযের হুকুমের উপর কিয়াস করেছেন।

এটা দ্বারা বুঝা গেছে যে, সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যে নামায অস্বীকারকারীদের মোকাবেলাতে জিহাদ করা জরুরী ছিল। অতএব, হযরত আবু বকর রা. এর উপর কেয়াস করে বলেছেন, ঐ হুকুম যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। অবশ্য পরে জানা গেছে যে, তাঁর ঐ কেয়াস ছহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীছের মুওয়াফেক হয়েছে। যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হযরত আনাস রা.ও হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে মানুষের সাথে জিহাদ করার জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকৃতি দিবে না এবং নামায আদায় করবে না এবং যাকাত দিবে না। অধিকাংশ হাদীছ বিশারদগণ বলেন, উক্ত হাদীছ প্রথমে হযরত আবু বকর রা.ও হযরত উমর রা. এর নিকট পৌঁছেনি। এজন্য তাঁরা ইজতিহাদ ও কিয়াসের ভিত্তিতে মতবিনিময় করে ফয়সালা দিয়েছেন, আর এজন্য মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, কোনো হাদীছ যদি বড়দের নিকট না পৌঁছে এবং তাঁদেরও কোনো হাদীছ অজানা থাকে তবে তা দূষণীয় নয়।

আলোচনার শেষভাগে হযরত উমর রা.বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি এই ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হযরত আবুবকর রা.এর অন্তরে বাস্তব হক কথা ঢেলে দিয়েছেন। তাই আমি তাঁর জিহাদের প্রস্তাব সাদরে মেনে নিলাম। অতঃপর সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রা.এর ডাকে মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ঐক্যবদ্ধভাবে শরীক হলেন। সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম এই বিষয়ে হযরত আবু বকর রা. এর অনুসরণ করলেন। এটাই তাকলীদে শাখছী।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রা.এর খেলাফতের শুরুলগ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজ ছিলো, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ঐ ব্যাপারে আবু বকর রা.

যাকাতকে নামাযের উপর কিয়াস করে জিহাদের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে সবার ঐকমত্যে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এইটা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ছাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যে কিয়াস ইসলামের দলীল।

৩. **আবু বকর রা. কর্তৃক উমর রা.কে খলীফা নিযুক্তিকরণঃ** হযরত আবু বকর রা. তাঁর খিলাফতের শেষ আমলে ইজতিহাদ করে হযরত উমর রা. কে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নির্ধারিত করেছিলেন। অথচ হাদীছের কোথাও এই কথার উল্লেখ নেই যে, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা.কে বলেছিলেন যে, হে আবু বকর! তোমার খেলাফতের শেষামলে উমরকে খলীফা নির্বাচিত করিও। অতঃপর সকল ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈগণ হযরত আবু বকর রা. এর উক্ত ইজতিহাদী কাজে ঐকমত্য পোষণ করে হযরত উমর রা. এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। যার বিস্তারিত বিবরণ ইজমার আলোচনায় আসছে। আর এটাই তাকলীদে শাখছীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । হযরত উমর রা. এর শাহাদতের আগ পর্যন্ত ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈগণ দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরই অনুকরণ-অনুসরণ করেন এবং তাঁরই তাকলীদ করেন । এইটাই তাকলীদে শাখছী।

৪. হযরত উমর রা. যখন কাফের মাল'উন আবু লু'লুর আঘাতে মারাত্মক আহত হন তখন তিনি ইজতিহাদ করে ৬ জনবিশিষ্ট একটি খেলাফত কমিঠি গঠন করেন। আর বলেন, আপনারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে এই ছয়জনের যেকোনো একজনকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। তারা হযরত উমর রা. এর ইন্তেকালের পর পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে ইজতিহাদের ভিত্তিতে হযরত উসমান রা. কে খলীফা নিযুক্ত করেন।

৫. হযরত উসমান রা. এর খেলাফত আমলেও সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈন সর্ববিষয়ে তাঁর অনুকরণ করতেন এবং তাঁরই তাকলীদ করতেন। আর এটাই তাকলীদে শাখছী তথা একক ব্যক্তির অনুসরণ।

৬. হযরত উসমান রা. এর শাহাদতের পর ছাহাবায়ে কেরাম হযরত আলী রা.কে খলীফা নিযুক্ত করেন। তাঁর খেলাফত আমলেও ছাহাবায়ে কেরাম তাঁরই অনুকরণ করেন এবং তারই তাকলীদ করেন। আর এটাকেই বলে তাকলীদে শাখছী।

৭. খলীফাদের সিয়াসত তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিচার-আচারসহ অন্যান্য ইন্তিযামী কাজসমূহ কোরআন-হাদীছের আলোকে সম্পাদন হতো। এজন্য তাঁদের মো'আমালাত মো'আশারাত, সিয়াসতসহ সার্বিক ইন্তিযাম ছিলো দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই জন্য ছাহাবায়ে কেরাম সকল বিষয়ে তাঁদের অকুণ্ঠিতচিত্তে অনুসরণ ও সন্তুষ্টচিত্তে অনুকরণ করে চলতেন।

মোদ্দাকথা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অনুযায়ী ছাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেক খলীফার যুগে রাষ্ট্রীয় ও দ্বীনি বিষয়ে এবং নবসৃষ্ট সমস্যা ও ঘটনাবলীর বিষয়ে খলীফার অনুকরণ করেই চলতেন। এটাই তাকলীদে শাখছী। তবে কোনো মুজতাহিদ ছাহাবী গাইরে মানছুছ তথা ইজতিহাদী মাসআলার ব্যাপারে নিজের ইজতিহাদের আলোকে কোন কোন কাজ করেছেন, কারণ মুজতাহিদের জন্য প্রত্যেক ইজতিহাদী মাসআলাতে আরেক মুজতাহিদের অনুকরণ করা জরুরী নয়। প্রত্যেক খলীফা কখনো কখনো অন্যান্য মুজতাহিদ ও বড় ছাহাবায়ে কেরামের সাথেও পরামর্শ করতেন এবং তদনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম চালাতেন।

৮. প্রত্যেক খলীফা নিজ নিজ আমলে মুজতাহিদ ছাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন জায়গায় আমীর নিযুক্ত করে পাঠাতেন। ঐসব এলাকার মুসলমানরা দ্বীনের যাবতীয় কাজ ও আমলে প্রেরিত আমীরের অনুকরণ ও তাকলীদ করতেন। আর এটাই হলো তাকলীদে শাখছী।

৯. মিশকাত শরীফ ফরায়েয অধ্যায়, পৃ:২৬৪, বোখারী শরীফ থেকে গৃহীত এক হাদীছের শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জলীলুল কদর ছাহাবী হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. থেকে একটি মীরাছের মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। পরবর্তীতে একই মাসআলা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.এর নিকট পেশ করা হলে তিনি উক্ত মাসআলার উত্তরের ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। হযরত আবু মূসা আশআরী রা. তাঁর উত্তর শুনে বললেন,

لاتسئلوني مادام هذا الحبر فيكم

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যতদিন এই মহাজ্ঞানী আলেম থাকবেন (হযরত ইবনে মাসউদ জীবিত থাকবেন), ততদিন আমাকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে না। বরং একমাত্র তাঁর থেকেই জেনে নিবে।

উল্লিখিত হাদীছে হযরত আবু মূসা রা. সাধারণ মুসলমানদেরকে এবং ইজতিহাদে অক্ষম বা কম ক্ষমতাসম্পন্নদেরকে শুধুমাত্র ইবনে মাসউদ রা. থেকে জেনে জেনে তাঁর অনুকরণ করে আমল করার জন্য বলেছেন। আর এটাই হলো তাকলীদে শাখছী যা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলন ছিলো।

তাকলীদে শাখছী :তাবে'ঈন ও তবে-তাবে'ঈনগণের যুগে

বোখারী শরীফ ২য় খ. ৬৬৩ পৃ. এবং ১০১৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরীফ ২য়;খ.৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত আমবাসা রা. শাম (সিরিয়া) দেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا

হে শামবাসী! তোমাদের মধ্যে যতদিন হযরত আবু কেলাবা রহ. অথবা তাঁর মত ইলম ওয়ালা ব্যক্তি থাকবেন, ততদিন তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

এটা বলার উদ্দেশ্য হলো, তিনি শামদেশের লোকদেরকে আবু কেলাবা রহ. এর তাকলীদ ও অনুকরণ করে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে বলা হয়েছে, ইমাম আওযা'য়ী (মৃত.১৫৭হি.) ছিলেন হাফেযে হাদীছ ও বড়মাপের মুজতাহিদ। শামের অধিবাসীরা বহুদিন যাবৎ তাঁর মুকাল্লিদ ছিলেন। তাঁর তাকলীদ করে আমল করতেন। তবে তাঁর মাযহাবের উপর লিখিত কিতাব না থাকায় তাঁর তাকলিদের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায খ.১ পৃ.১৭২)

ইমাম বোরহান উদ্দিন ইবনে আলি তার লিখিত কিতাব আদ-দিবাজুল মাযহাবীতে উল্লেখ করেন, শাম ও উন্দুলুসে ইমাম আওযা'য়ী রহ.এর মাযহাবের প্রভাব বেশি ছিলো। কিন্তু ২০০হিজরীর পরে উক্ত দু'দেশে মালেকী মাযহাবের চর্চা শুরু হয়। তিনি আরো লিখেছেন, মুসলমানরা বিক্ষিপ্তভাবে হযরত হাসান বসরী রহ. ও সুফিয়ান সাওরী রহ.এর তাকলীদ করতেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুপরবর্তী সময়ে তাঁদের লিখিত না থাকার কারণে তাঁদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফা রহ.এর মুকাল্লিদগণ

তবে-তাবে'ঈন ও পরবর্তী যুগের অনেক যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিছগণ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্য ও মুকাল্লিদ ছিলেন। তার কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হলো।

১. গ্রহণযোগ্য কিতাব আল জাওয়াহিরুল মাযিয়াতে আছে যে, কাযী ইসমাঈল ইবনে নাসফী (মৃ:১৬৪ হি.) ইমামে আযম আবু হানীফা রহ.এর মুকাল্লিদ ছিলেন। তাঁকে মিসরের কাযী তথা বিচারপতি বানানো হয়েছিলো।

(আল জাওয়াহিরুল মাযিয়া, খ.১, পৃ.১৬)

২. আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী রহ.কর্তৃক লিখিত তাহযিবুত তাহাযীব নামক কিতাব এবং ইমাম নববী রহ. কর্তৃক লিখিত তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত কিতাবে আছে ইমাম লাইছ ইবনে সা'আদ (মৃ.১৭৫ হি.) যিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও 'ছেকা' (বিশ্বস্ত) তথা হাদীছের ব্যাপারে সর্বজন নির্ভরযোগ্য মনীষী ছিলেন। তিনি নিজ যুগের প্রসিদ্ধ মুফতি ও কাযী ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.মুকাল্লিদ ছিলেন।

(তাহযিব খ. ৮ পৃ:৪৬১; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত খ.১, পৃ.৭৪)

হিন্দুস্তানের গাইরে মুকাল্লিদের সবচেয়ে বড় আলেম ও অন্যতম মুরব্বী নবাব ছিদ্দীক হাসান ছাহেব তাঁর ইত্তেহাফ কিতাবে ফার্সীভাষাতে লিখেছেন

وے حنفی مذہب بود قضائے مصر داشت

ইমাম লাইস ইবনে সা'আদ হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন এবং মিসরের বিচারপতি ছিলেন।(ইত্তেহাফ, পৃ. ২৩৭)

৩. আল্লাম যাহাবী তাযকিরাতুল-হুফ্ফায ১ম খ. ৩৫৩ পৃ. তে লিখেছেন, (প্রকাশ থাকে যে, তাযকিরাতুল হুফ্ফায কিতাবে এই উম্মতে যারা হাদীছের হাফেয ছিলেন, সংক্ষেপে তাঁদের জীবনী লিখা হয়েছে। উক্ত কিতাবটি সর্বমহলের আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত।) ইমামুল মুহাদ্দিছীন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. (মৃত ১৮১ হি.) হাফেযে হাদীছ ছিলেন। তারীখে বাগদাদ ১৩ খ. ৩৫৫ পৃষ্ঠা ও মানাকেরে মুয়াক্কফ ১ম খ.৩২৬ পৃষ্ঠায় আছে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. বলেছেন, ''আমার কাছে ফিকহের যে ইলম আছে তা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে শিখেছি''।

আবুল ওয়ালিদ কাযী মালেকী শরহে মুয়াত্তায় (৭ম খ.৩০০ পৃ. মিসরের ছাপা) লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ.এর শিষ্য এবং মুকাল্লিদ ছিলেন। ইমাম সদরুল আইয়িম্মা মক্কী এবং মাওলানা আমর ইবনে মোস্তফা লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. হানফী মাযহাবের ইমামদের এক বরেণ্য ইমাম ছিলেন।

(মানাকেরে মুয়াক্কফ ২য় খ. ১৩৩ পৃ.; মিফতাহুস সায়েদা ২য় খ.১১২ পৃ.)

৪. ইমাম ওকী' ইবনে জাররাহ (ইমাম শাফেয়ী রহ.এর উস্তাদ, মৃত:১৯৭ হি.) যিনি যুগের ইমামুল মুহাদ্দিছীন, হাফেযে হাদীছ ও সর্বজনমান্য যুগশ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.এর ফেকাহ ও ইজতিহাদের অনুকরণ করে ফতওয়া দিতেন।

(তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খ. ২৮২ পৃ. জামেয়ু বায়ানিল ইলম, ২য় খ. ১৪৯ পৃ; তাহযিবুত তাহযিব ১১ম খ. ১২৭পৃ.)

ইমাম ইবনে আব্দুল বর মালেকী রহ. জামেয়ু বায়ানিল ইলমে লিখেছেন, ইমাম ওকী' রহ ইমাম আযম আবু হানিফা রাহ.এর ইজতিহাদ অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন। আবু হানিফা রহ. থেকে তিনি অনেক হাদীছ নিয়েছেন এবং সমস্ত হাদীছ তিনি মুখস্থ করেছেন।

(জামেয়ু বায়ানিল ইলম,খ:২ পৃ:১৪৯)

৫. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ আল-কাত্তান রহ. (মৃ:১৯৮ হি.) যিনি যুগের সকল হাফেযে হাদীছের ইমাম ছিলেন, তিনি হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইজতিহাদ অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি আল্লাহ তা'আলার অসীম নিয়ামতের না শোকর করতে পারি না। সত্যকথা বলতে আমি কোনো দ্বিধাবোধ করি না; আমি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর রায় থেকে অন্য কোনো মুজতাহিদের রায়কে উত্তম পাইনি। এইজন্য তাঁর অধিকাংশ ইজতিহাদী বাণী আমি গ্রহণ করেছি। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ.১, পৃ.২৭৪-২৮২; তাহযিবুত তাহযিব খ.১, পৃ.৪৫০; আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া খ.২, পৃ.২০৯; তারীখে বাগদাদ খ.১৩, পৃ.৩৫৪)

৬. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবি যায়েদা (মৃ.১৮২হি.) তিনি হাফেযে হাদীছ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ ছিলেন। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খ. ২৪৬পৃ.) মিফতাহুস সায়েদা ২য় খ. ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তিনি আবু হানিফা রহ. এর মুকাল্লিদ ও হানফী মাযহাবের একজন ইমাম ছিলেন।

৭. তাহযিবুত তাহযিব গ্রন্থে আছে ইমাম আব্দুল গাফ্ফার দাউদ আল হারানী (মৃ:২০৪ হি.) যিনি ইলমে হাদীছের ছেকা ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন।

(তাহযিবুত তাহযিব খ.৬ পৃ.৩৬৫)

৮. তারীখে বাগদাদে আছে যে, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (মৃ:২৩৩ হি.) যিনি সে যুগের ইমামুল জরহি ওয়াত-তা'দীল তথা হাদীছ যাচাইয়ের ব্যাপারে বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। সর্বজনমান্য ও গ্রহণযোগ্য হাদীছবিশারদ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। হাফেয ইবনে হাজর 'আসকালানী রহ. কর্তৃক

রচিত কিতাব তাহযীবুত তাহযীবে তিনি বলেন, আল্লমা যাহাবী রাহ.তার রচিত কিতাব "الرواة الثقات المتكلم فيهم بما يوجب ردهم" এর ৭ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ. এত বড় ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ কট্টর হানফী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন।

(তারীখে বাগদাদ: খ.১৪, পৃ.১৮৪; তাহযীবুত তাহযীব খ.১১, পৃ. ২৮৮)

তারিখে বাগদাদে রয়েছে, ইমাম ইবনে মুঈন রহ. বলেছেন, আমার নিকট ইমাম হামযা রহ.এর কেরাত ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকাহ বেশী গ্রহণযোগ্য। আর আমি সকল মানুষকে ইমাম আযমের ফেকাহকে অনুসরণ করতে দেখেছি। এটাই তো তাকলীদে শাখছীর জ্বলন্ত প্রমাণ।

(তারিখে বাগদাদ:খ: ২ , পৃ:২০৯)

ফয়যুল বারী ও নছবুর রায়ার ভূমিকায় রয়েছে, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ. হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ও ভক্ত ছিলেন।

(ফয়যুল বারী খ:১, পৃ: ১৬৯ , নছবুর রায়ার ভূমিকা পৃ:৪২)

তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে আল্লামা যাহাবী রহ. লিখেছেন, ঐ যুগে ইলমে হাদীছের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন তিন ব্যক্তি :

১. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদিনিল কাত্তান রহ.
২. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে যায়েদা রহ.
৩. ইমাম ওকী ইবনে জাররাহ রহ.

"আকাবেরু আবি হানীফা ওয়া আছহাবিহি" নামক কিতাবে ইমাম আলী ইবনে মাদীনী রহ. লিখেছেন, ঐ যুগে ইলমে হাদীছ ইয়াহইয়া ইবনে যায়েদার উপর সমাপ্ত তথা তিনি ইলমে হাদীছের শেষ ঘাঁটি ছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ উল্লিখিত তিন মহামনীষী ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায খ:১, পৃ: ৩২৮. আকাবেরু আবি হানীফা ওয়া আছহাবিহি পৃ: ১৫০)

আল্লামা যাহাবী রহ. মিযানুল ই'তেদালে ও আল্লামা জাযরী রহ. 'তাওযীহুন নযর' নামক কিতাবে লিখেছেন, রাবীদের ব্যাপারে যাচায়-বাছায় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উসূল তথা মূলনীতি প্রথমে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ আল-কাত্তান রহ. কোরআন ও হাদীছের আলোকে প্রণয়ন করেছেন। অতঃপর তাঁর শিষ্যরা এই শাস্ত্রের প্রচার-প্রসার করেছেন। এতে স্পষ্ট হলো যে, হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ইমামগণই ছিলেন ইলমে হাদীছের মারকায ও মূলব্যক্তি। (মিযানুল ই'তেদাল খ.১, পৃ.২; তাওযীহুন নযর পৃ.১১৩)

এতে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, ইমামে আযম আবু হানীফা রহ. ছিলেন ঐ যুগের সমস্ত হাদীছ বিশারদ ও হাদীছের ইমামগণের এবং সমস্ত মুজতাহিদগণের প্রাণকেন্দ্র। যদিও কিছু অন্ধ ও জ্ঞানপাপী হিংসুক তথাকথিত আহলে-হাদীছদের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফা রহ. নাকি হাদীছ জানতেন না। তবে তা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, সূর্যের আলো বাদুড়ের নিকট ভালো লাগে না।

অন্যান্য ইমামদের ক্ষেত্রে তাকলীদে শাখছীর আরো কিছু দৃষ্টান্ত

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে রয়েছে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাকাম (মৃত ২০৮ হি.) যিনি ইমাম ও হাফেযে হাদীছ ছিলেন। তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী মিসরের বড় ফকীহ ছিলেন।

(তাযকিরাতুল হুফ্ফায খ.২ পৃ.১১৬)

২. আল্লামা সুয়ূতী রহ. কর্তৃক রচিত তারীখুল খোলাফাতে তিনি লিখেছেন, খলীফা জা'ফর ইবনে মু'তাসিম (মৃত: ২৪৬ হি.) যার লকব ছিলো 'আলমোতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ', তিনি শাফে'য়ী রাহ.এর মুকাল্লিদ ছিলেন।

(তারীখুল খোলাফা পৃ.৩৫৯)

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে রয়েছে, ইমাম আব্দুল মালেক ইবনে হাবীব (রাহ.) (মৃ.২৩৯ হি.) যিনি হাফেযে হাদীছ ও বড় মাপের ফকীহ ছিলেন। তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

(তাযকিরাতুল হুফ্ফায খ.২ পৃ. ১০৭)

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে রয়েছে ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মা'দী (মৃত.১৯৮ হি.) তিনিও হাফেযে হাদীছ এবং ইমামে হাদীছ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবনে মাদায়েন রহ. তার লিখিত কিতাব আদদিবাজুল মাযহাবীতে বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে মা'দী রহ. ইমাম মালেক রহ. এর অনুসারী ছিলেন। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায খ.১ পৃ.৩০২; আদদিবাজুল মাযহাবী পৃ.৩৪৬)

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফায (খ.২, পৃ.১৩৫) এ লিখা হয়েছে যে, ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদানিল আছরাম (মৃত:২৬০ হি.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.এর শিষ্য ও মুকাল্লিদ ছিলেন। এপর্যন্ত যে-সব হাফেযে হাদীছ ও হাদীছবিশারদ ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকজন

ছাড়া তাদের প্রায় তবেতাবেঈন ছিলেন তথা খাইরুল কুরুনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইলমে হাদীছের বড় বড় ইমাম হওয়া সত্ত্বেও চার ইমামের যে কোনো এক ইমামের তাকলীদ গ্রহণ করে তাকলীদ শাখছীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানদের আমল কিয়ামতাবধি আগতদের জন্য সনদ

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ থেকে গৃহীত মিশকাত শরীফের বাবু মানাকিবুছ ছাহাবা ৫৫৩ পৃ.তে ইমরান ইবনে হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত :

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " الحديث

রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের উত্তম লোক হলো যারা আমার যুগের অর্থাৎ হুযুরের ছাহাবায়ে কেরাম রা.। তারপর ঐ সকল মহামনীষী যাদের যুগ ছাহাবায়ে কেরামের যুগসংলগ্ন; অর্থাৎ তাবে'ঈন রাহ। অতঃপর তাবে'ঈন হযরাতের যুগপরবর্তীতে যারা আসবেন; তথা তবে-তাবেঈন রহ.।

উপর্যুক্ত হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত প্রথম তিনযুগ ইসলামের স্বর্ণযুগ। উক্ত তিনযুগের মুসলমানদের আমল হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতের জন্য সনদ। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উল্লিখিত বয়ান দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, উক্ত তিনযুগের মুসলমানগণ বর্ণিত ধারা অনুযায়ী ঈমান-আমল, তাকওয়া-তাওয়াক্কুল, যোগ্যতা, সভ্যতাসংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সততা, আমানতদারী ও ন্যায়-নিষ্ঠা তথা দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের উম্মত থেকে উত্তম এবং তাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা তথা উত্তম আদর্শ ছিলেন। তাই সর্বক্ষেত্রে সমস্ত উম্মতকে উক্ত তিনযুগের মুজতাহিদদের অনুকরণ করে আমল করতে হবে।

উপরের তাফসীলী বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ও তার পরের দুই স্বর্ণযুগে তাকলীদে শাখছীর প্রথা এই তিন যুগের মহামনীষীদের ঐকমত্যে কারো আপত্তি ছাড়া চালু হয়েছে। এটাই হলো তাকলীদে শাখছীর ব্যাপারে তাঁদের আমলী ইজমা। যা তাঁদের পরবর্তী উম্মতের জন্য সনদ। তাই তাঁদের পরে যারা তাকলীদে শাখছীর অস্বীকার

করছে তারা ইসলামের প্রথম তিন স্বর্ণযুগের ইজমা'য়ী আমলকে অস্বীকার করছে। যা স্পষ্ট শরী'আতবিরোধী।

মোদ্দাকথা, কোরআন মাজিদের উল্লিখিত আয়াত ও ছহীহ হাদীছসমূহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত আমল ও বাণী; উল্লিখিত বিজ্ঞ প্রসিদ্ধ হাদীছবিশারদ, মুজতাহিদ তাবেঈন ও তবে-তাবেঈনের বাণী ও আমলসমূহ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ইজতিহাদী আহকামের ব্যাপারে যদি ওহী নাযেল না হয়, তবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ইজতিহাদ করা ওয়াজিব। তদ্রূপ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতি এবং তাঁর ইন্তিকালের পর ইজতিহাদী আহকামের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে শরয়ী ফয়সালা দেয়া মুজতাহিদগণের যিম্মায় ওয়াজিব। অতঃপর ইজতিহাদে অক্ষম বা তুলনামূলক কম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা ওয়াজিব এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল ও সমর্থন এবং খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তবেতাবেঈন রাহ.এর আমল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাকলীদে শাখছী ওয়াজিব।

উল্লিখিত দাবীসমূহের ব্যাপারে হিন্দুস্তানের গাইরে মুকাল্লিদের আমীর জনাব নবাব ছিদ্দীক হাসান ছাহেবের তাফসীর ও তারীখের কিতাব থেকে তার ইবারতও নকল করা হয়েছে। মৌসুমী ফল যেমন ফলের মৌসুমে, হাটে-ঘাটে, পাড়ায়-মহল্লায়, সর্বত্র প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়; তেমনিভাবে তবেতাবেঈনের যুগে তাকলীদে শাখছীর প্রথা প্রথমে হাফেযে হাদীছ ও আহলে ইলমদের মধ্যে; অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হারে চালু হয়। আর পূর্বে দৃঢ় প্রমাণাদি ও গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তবেতাবেঈন ইজতিহাদ করে ফয়সালা দিয়েছেন;অতঃপর ঐ যুগের মুসলমানরা তাঁদের তাকলীদ করে আমল করেছেন। ইমাম আওযায়ী, ইমাম হাসান বাসরী, মুজতাহিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁদের ইজতিহাদী ফয়সালাসমূহের ব্যাপারে লিখিত কোন কিতাব পাওয়া না যাওয়ার কারণে তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আলহামদুলিল্লাহ চার ইমাম ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেঈ রাহ., ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ., কুরআন-হাদীছের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে ইজতিহাদী উসূল কায়েম করেছেন

এবং ঐসব উসূলের ভিত্তিতে ইজতিহাদী আহকামের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। সাথে সাথে তাঁদের উল্লিখিত উসূলসমূহ ও ফয়সালাসমূহকে কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। একারণে যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও আহলে ইলমগণ এবং সাধারণ মুসলমানরা যেমনিভাবে উল্লিখিত চার ইমাম থেকে নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদ করে আমল করেছেন; তেমনিভাবে পরের যুগের সর্বজনগ্রহণযোগ্য হাফেযে হাদীছ যেমন, ইমাম বুখারী রহ. এবং অন্যান্য হাদীছগ্রন্থের লিখকগণ, সাথে সাথে বিজ্ঞ ও বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমানরা চার ইমামের নির্দিষ্ট যেকোন একজনের তাকলীদ করে আমল করার প্রথা জারী রেখেছেন।

খায়রুল কুরুনের যুগেই তাকলীদে শাখছীর উপর ইজমা

প্রকাশ থাকে যে, খায়রুল কুরুনের হাদীছটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তবে-তাবেঈনের যুগ ২২০ হিজরীতে প্রায় শেষ হয়ে যায়। (মুজাহেরে হক জাদীদ খ.৭; মানাকেবে ছাহাবা পৃ.২৬৬)

ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে যে, খায়রুল কুরুনের আহলে ইলমদের ইজমা'য়ী আমল দ্বারা তাকলীদে শাখছী ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। তবে ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী রহ. ইনছাফ নামক কিতাবে লিখেছেন যে, উক্ত ইজমা মুসলমানদের সর্বস্তরে প্রকাশ পেয়েছে দুইশত হিজরীর পর।

তিনি ইনছাফ নামক কিতাবে লিখেছেন ,

وبعد المأتين ظهر التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وقل من كان لايعتمد علي مذهب مجتهد بعينه وكان هذاالواجب في ذلك الزمان الخ

(তিনি বলেছেন) ''দু'শত হিজরীর পর নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব গ্রহণ করা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঐ যুগের মুসলমানগণ নির্দিষ্ট যেকোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করে আমল করতেন। খুব নগণ্যসংখ্যক লোক তাকলীদ থেকে বিরত ছিলো। আর এভাবে নির্দিষ্ট যেকোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা তাদের উপর ওয়াজিব ছিলো''। কারণ, খায়রুল কুরুনের শেষভাগে তবে-তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত সকল হাফেযে হাদীছ ও মুজতাহিদ, বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে শতসিদ্ধ এই বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, যেকোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করতে হবে; যা তাঁদের ইজমা'য়ী

আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। যার ব্যাপারে পূর্বে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে।

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তাকলীদে শাখছী তথা চার মাযহাব থেকে নির্দিষ্ট যেকোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করে আমল করা, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। শাহ ছাহেবের উক্ত ঐতিহাসিক উক্তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হলো যে, দু'শত হিজরীর পূর্বেই তথা খাইরুল কুরুনের যুগেই তাকলীদে শাখছীর উপর ইজমা হয়ে গিয়েছিলো, যদিও তা দু'শত হিজরীর পরে প্রকাশ পেয়েছিলো। তাই যারা বলেছেন যে, চার মাযহাব অনুযায়ী আমল করা চারশত হিজরীর ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তারা তা না জেনে বলেছেন। এজন্য শাহ ছাহেবের হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার এবারত এবং যে-সব উলামায়ে কেরামের কলমে লিখা হয়েছে যে চারশত হিজরীর পর চার মাযহাবের উপর ইজমা হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ হলো, চারশত হিজরীর পর সারা পৃথিবীজুড়ে মুসলমানদের মধ্যে জরিপ লাগানোর পর দেখা গেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্র ও এলাকার মুসলমান হাতেগুনা কিছুলোক ব্যতীত, সবাই চার মাযহাবের নির্দিষ্ট যেকোনো একটির মুকাল্লিদ ছিলেন। বাস্তব ইজমা দু'শত হিজরীর শেষভাগে অর্থাৎ খায়রুল কুরুনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাইতো দুইশত হিজরীর পরপরেই চার মাযহাবের তাকলীদ সর্বমহলে ব্যাপকহারে সামাদৃত ও বিস্তৃত হয়েছে। যা শাহ ছাহেবের ইনছাফ নামক কিতাবের ইবারতে স্পষ্টাভাবে ফুটে উঠেছে। এতে করে আশা করি সত্যান্বেষী আহলে হাদীছ ভাইদের নিকট পরিস্কার হবে যে, চার মাযহাবের উপর ইজমা কিভাবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হলো?

বিখ্যাত মুহাদ্দিছীনে কেরামগণ মাযহাবাবলম্বী ছিলেন

ইলমে হাদীছের বড় বড় ইমামগণ, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম চার মাযহাব থেকে নির্দিষ্ট এক মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন। এই ব্যাপারে অনেক গ্রহণযোগ্য কিতাবে তাঁদের তালিকা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি হিন্দুস্তানের গাইরে মুকাল্লিদদের আমীর জনাব নবাব ছিদ্দীক হাসান ছাহেবের লিখিত কিতাবের বরাত দিয়ে লিখছি, যাতে মুসলমান ভাইরা তাকলীদের ব্যাপারে শিরক, বিদ'আত হারাম ইত্যাদি ফতওয়াদাতা ধোঁকাবাজদের ধোঁকা বুঝতে সহজ হয়। নবাব ছিদ্দীক খান ছাহেব তার লিখিত কিতাব আলহত্তা ফী ছিহাহিস সিত্তা নামক কিতাবে নিম্নের তালিকাটি লিখেছেন,

ক্রমিক	ইমাম ও মাযহাবের নাম	পৃষ্ঠা
১	ইমাম বোখারী রহ. শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২৮১
২	ইমাম মুসলিম রহ. শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২২৮
৩	ইমাম নাসাঈ রহ. শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২৯৩
৪	ইমাম আবু দাউদ রাহ.হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ। কেউ কেউ বলেছেন তিনি শাফেঈ ছিলেন।	২৮৮
৫	শেখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ।	৩০০
৬	আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ।	১৬৮
৭	আল্লামা ইবনে কাইয়ুম রহ. হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ।	১৬৮
৮	শেখ আব্দুল ওহাব নজদী রহ. হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ।	১৬৭
৯	মিশকাত শরীফ প্রণেতা শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ	১৩৫
১০	ইমাম খাত্তাবী, ইমাম নববী রহ.শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ।	১৩৫
১১	ইমাম ত্বাহাবী রহ. হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ	১৩৫
১২	ইমাম ইবনে আব্দুল বর রহ. মালেকী মাযহাবের মুকাল্লিদ	১৩৫
১৩	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী ও শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. এবং তাঁর বংশধরগণ হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ	১৬০-১৬৩
১৪	ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. মালেকী মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২১৩
১৫	আল্লামা শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুদ দায়েম শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২১৩
১৬	আল্লামা বদর উদ্দীন 'আইনী হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ।	২১৬
১৭	আল্লামা যারখশী শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ	২১৭
১৮	কাযী মুহিববুদ্দিন আহমদ হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ	২১৮
১৯	হাফেয ইবনে রজব রাহ.হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২১৯
২০	আল্লামা বলকিনী শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ	২২০
২১	আল্লামা ইবনে মরজুকী রহ. মালেকী মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২২০
২২	জালাউদ্দীন আলবকরী শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২২২
২৩	আল্লামা কাস্তলানী রহ. শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ।	২২২
২৪	আল্লামা ইবনে আরবী মালেকী মাযহাবের মুকালিদ	২২৪

নবাব ছিদ্দীক হাসান ছাহেব তার লিখিত কিতাব আবজাদুল উলূম (পৃ.৮১০) তেও ইমাম বোখারী রহ.কে শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ বলেছেন। (পৃ.৮১০) শায়খুল ইসলাম তাজউদ্দিন আবু নছর আব্দুল ওয়াহাব আসসাবকী আশশাফে'ঈ (মৃ.২৭৭) তবকাতে শাফিয়িয়্যাতুল কুবরা কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম বোখারী রহ. শাফেঈ মাযহাবাবলম্বী ছিলেন। (তবকাতে শাফিয়িয়্যাতুল কুবরা খ. ২, পৃ.১-১৯)

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলভী রহ. তার ইনছাফ নামক কিতাবে (উর্দূ কাশ্‌শাফ পৃ.৬৭৩) ইমাম বোখারী রহ. কে শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী লিখেছেন। তবে কোন কোন ফকীহ তাঁকে মুজতাহিদ বলেছেন, তা মুকাল্লিদ হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মুজতাহিদ হয়েও মুকাল্লিদ হতে পারে। শত শত মুজতাহিদ মুকাল্লিদ ছিলেন যেমন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মুহাম্মাদ রহ. মুজতাহিদ ছিলেন তারপরও তাঁরা ইমাম আবু হানীফা রহ.এর তাকলীদ করেছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

এখন সাধারণ মুসলমানদের নিকট আহলে হাদীছের ধোঁকাবাজি উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে; কারণ, ইমাম বোখারী রহ. ও মুসলিম রহ. তদুপরি হাদীছের অন্যান্য লিখকগণ, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. সহ উল্লিখিত মুহাদ্দেছ ও ফকীহকে তাদের ইমাম নবাব ছিদ্দীক হাসান ছাহেব মাযহাবাবলম্বী লিখেছেন। তখন তাদের ফতওয়া মতে তাকলীদ করার কারণে ঐ সমস্ত মহামান্য ইমাম, মুহাদ্দিছ ও ফুকাহায়ে কেরাম মুশরিক ও বিদ'আতি হয়ে গেলেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!! তাহলে গাইরে মুকাল্লিদরা কিভাবে তাদের কিতাবের হাওলা দিয়ে মাসআলা পেশ করে? তা সুস্পষ্ট ধোঁকাবাজী। যা সাধারণ মুসলমানরাও বুঝতে সক্ষম। অথচ খায়রুল কুরুনের হাদীছের ইমামরা, যেমন ইমাম বোখারী রহ. এর উস্তাদের উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ., ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ আল কাত্তান রাহ., ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া রহ., ইমাম ওকী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিছীন, যাঁরা ইলমে হাদীছের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন; তাঁরা সবাই মুকাল্লিদ ছিলেন। গাইরে মুকাল্লিদ ধোঁকাবাজদের ফতওয়া অনুযায়ী তাঁরা সবাই মুশরিক কিংবা বিদ'আতী সাব্যস্ত হয়। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্) এসব ধোঁকাবাজ ও ফতওয়াবাজদের জায়গা কোথায় হবে আল্লাহই জানেন। তাছাড়া অনেক গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে জানা যায় যে, উম্মতের আরো শতশত হাফেযে হাদীছ, হাদীছের ইমাম, ফুকাহায়ে কেরাম ও দ্বীনের যুগশ্রেষ্ঠ মহামনীষীগণ চার মাযহাবের যে কোন এক নির্দিষ্ট মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় তাঁদের সবার নাম পেশ করা সম্ভব হচ্ছে না, তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের তালিকা গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানার লিখিত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। এতটুকুতেই সচেতন ও জ্ঞানীলোকমাত্রই বুঝতে সক্ষম যে, তাদের ভণ্ডামী ও ভাওতাবাজী কতইনা মারাত্মক ।

শুধু চার মাযহাব কেন ?

প্রশ্ন হলো, চার মাযহাবের ইমামগণ ছাড়া মুজতাহিদ ইমামতো আরো ছিলেন, তথাপি মাযহাব চারটার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলো কেন ?

তার উত্তর হলো, দু'টি অবিনবার্য কারণবশতঃ চার ইমাম ছাড়া অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ সম্ভব নয়।

১ম কারণ হলো, চার ইমাম ছাড়া অন্যান্য ইমামদের পক্ষ থেকে উম্মতের যাবতীয় শর'য়ী সমস্যার সমাধান কল্পে উসূলে ফিকাহ তথা ইলমে ফিকাহর মূলনীতি ও ফেকাহশাস্ত্রে তথা শরী'আতের বিস্তারিত বিধিবিধান সম্বলিত সুবিন্যস্ত লিখিত গ্রন্থ সংরক্ষিত নেই।

২য় কারণ: যুগে যুগে চার ইমামের চার মাযহাবের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ আলেম বিদ্যমান ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন কিন্তু অন্য কোনো মুজতাহিদের উল্লেখযোগ্য কোন অনুসরণকারী আলেম বর্তমান নেই। একারণে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. দাউদে যাহেরীর মাযহাব সম্পর্কে লিখেছেন,

ثم دَرَسَ مُذْهَبُ أهْلِ الظاهراليوم بدروس أئمته

অর্থাৎ: বর্তমানে আহলে যাহেরের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে উক্ত মাযহাবের ধারকবাহক ইমামগণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে।

(মুকাদ্দমায়ে ইবনে খালদুন পৃ:৪৬)

একসঙ্গে একাধিক মাযহাবের অনুকরণ নাজায়েয কেন?

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿النحل :٤٥﴾

শরী'আতের যেসব ব্যাপারে তোমাদের ইলম নেই, সেসব ব্যাপারে ইলমওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা করবে; অর্থাৎ তাঁদের থেকে ইলম হাছিল করে সববিষয়ে আমল করবে। (সূরা নাহ্‌ল; আয়াত: ৪৩)

আল্লাহ তা'আলার উক্ত হুকুম পালন করার জন্য যে-সব বে-ইলম ও ইজতিহাদে অক্ষম ব্যক্তি চার মাযহাবের নির্দিষ্ট যে মাযহাবের তাকলীদ করেন, সে মাযহাবের লিখিত কিতাব পড়ে অথবা সে মাযহাবের আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে আমল করাই তার জন্য যথেষ্ট; অন্য মাযহাবের অনুকরণ করতে পারবে না এবং তা জায়েযও হবে না। কারণ, তাদের কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা না থাকায়, গৃহীত মাযহাবের যে কোনো মাসআলার অনুকরণ বাদ দিয়ে অন্য মাযহাবের মাসআলা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়, বরং তা মনপূজা। একমাত্র সুবিধাবাদী, নফসের পূজারীরা একেক মাসাআলাতে একেক ইমামের তাকলীদ করার কথা বলে। সাধারণ মুসলমানের জন্য একাধিক মাযহাবের তাকলীদ জায়েয হবে না কারণ তা হবে মনপূজা। মনপূজার কয়েকটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো।

নফসপূজার কতিপয় নমুনা

নমুনা-১

মাজমু'আয়ে ফাতাওয়ায়ে শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, প্রশ্ন হল, এক লোক ফাসেক ওলীর মাধ্যমে বিবাহ করেছে। সে ব্যক্তি হানফী মাযহাবের লোক ছিলো। হানফী মাযহাবসহ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের নিকট ফাসেক ওলীর মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে, তা শুদ্ধ হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি আপন মাযহাবের মতানুযায়ী উক্ত বিবাহ হালাল বিশ্বাস করে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেছে। কিছুদিন পর সেই স্ত্রীকে যে কোনো কারণে তিন তালাক দিয়েছে। এখন স্ত্রীকে একথা বলে আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় যে, আমি ফাসেক ওলীর মাধ্যমে বিবাহ করেছি, আর ইমাম শাফে'ঈ রাহ.এর নিকট ফাসেক ওলীর মাধ্যমে বিবাহ করলে শুদ্ধ হয় না; তাই আমার পূর্বের বিবাহ ছহীহ হয়নি বিধায় ঐমহিলাটির উপর তালাকও পতিত হয়নি– সুতরাং তাকে এখন বিবাহ করতে পারব। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. প্রতি-উত্তরে বলেন, তার জন্য তা জায়েয হবে না, বরং হারাম হবে। কারণ, যে ইমামের মতে ফাসেক ওলীর মাধ্যমে বিবাহ জায়েয, সে সেই ইমামের তাকলীদ করে;অর্থাৎ বিবাহকে হালাল বিশ্বাস করে সে ঐ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তার সাথে সহবাস ইত্যাদি করেছে। এখন তিন তালাক দেয়ার পর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ হালালকে হারাম বলছে। উক্ত ব্যক্তির এ দ্বিমুখী নীতি সমস্ত মুজতাহিদগণের ইজমা পরিপন্থী। তার উক্ত কাজ মনপূজার জন্য হয়েছে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য নয়। তাই তা হারাম।

(মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া, খ.৩২, পৃ.৬৬-৬৭)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. এক ইমামের তাকলীদ ছেড়ে সুবিধার জন্য অন্য ইমামের তাকলীদের মতো কদর্যপূর্ণ কাজের খারাবী; হক্কে শুফ'আ ও মীরাছের মাসআলাতে আরো বিস্তারিত লিখেছেন। উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি আরো লিখেছেন, যদি ঐ ব্যক্তি এখন বলে, ফাসেক ওলীর মাধ্যমে বিবাহ জায়েয হবে না; এ-ব্যাপারে আগে আমার জানা ছিল না, এখন জানলাম–এখন থেকে এমতে তাকলীদ করবো, তা হলেও তার জন্য তা জায়েয হবে না। কারণ, এ-পরিবর্তনও তার প্রবৃত্তিপূজাছাড়া আর কিছুই না। আর মনেরপ্রবৃত্তি চরিতার্থকরণ দ্বারা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ আমল খেলনায় পরিণত হয়।

তিনি উক্ত কিতাবের উসূলুল ফিকাহ অধ্যায়ে লিখেছেন, যারা ইজতিহাদী ক্ষমতা না থাকার কারণে, কোরআন-হাদীছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম বুঝতে অক্ষম, তারা আহলে ইলম;অর্থাৎ মুজতাহিদের অনুকরণ করে জীবন অতিবাহিত করবে, তবেই তারা প্রশংসাযোগ্য এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান ও ছাওয়াব দান করবেন। (খ.২০, পৃ.)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ.এর উক্ত ফতওয়া মতে যদি কোন হানফী মাযহাবের বা অন্য কোন মাযহাবের মানুষ নিজের স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তারা যদি গাইরে মুকাল্লিদের ফতওয়া অনুকরণ করে উক্ত স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনে আছে মনে করে সহবাস ইত্যাদি করে, তবে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং যিনার গুনাহ হবে; ঐসহবাসের মাধ্যমে সন্তান জন্ম নিলে তা জারজ সন্ত ান হবে। কারণ, যে হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ; হানফী মাযহাবানুযায়ী সে যদি নিজ স্ত্রীকে এক বাক্যে বা এক বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করে; যদিও তার উক্ত কাজ বিদ'আত তথাপি তিন তালাক পতিত হয়ে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। সকল হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদের আকীদা-বিশ্বাস তাই। উক্ত মুকাল্লিদের আকীদাও তাই। এখন সে যদি গাইরে মুকাল্লিদের ফতওয়ার অনুকরণ করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য পূর্বের হারামকে হালাল বিশ্বাস করে তবে তা মনপূজা-প্রবৃত্তিপূজা ছাড়া আর কিছুই না, আর মনপূজা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

সারকথা ইজতিহাদে অক্ষম তথা এ-যুগের যে কোনো মুসলমানের জন্য এক সাথে একাধিক মাযহাবের তাকলীদ জায়েয হবে না। কারণ, তা হবে তালফীক;অর্থাৎ সুবিধাবাদ ও প্রবৃত্তিপূজা। যা পরিস্কারভাবে হারাম। যার আরো কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

নমুনা-২

হানফী মাযহাব মতে শরীরের যে কোনো অঙ্গ থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে অযু ভেঙ্গে যায়; কিন্তু কোন হানফী লোকের ঐ ধরণের রক্ত বের হলে, সে যদি অলসতা কিম্বা ঠাণ্ডা ইত্যাদির কারণে শাফেঈ মাযহাবের মতানুযায়ী অযু না করে নামায আদায় করে বসে; তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। তার এ-কাজ হারাম হবে। অনুরূপ উক্ত ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় কোন শাফে'ঈ ইমামের পিছনে ইক্তিদা করে নামায পড়ে এবং সে হানফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তাহলে উভয় মাযহাবের ফতওয়া মতে তার নামায ছহীহ হবে না।

নমুনা-৩

কোন শাফে'ঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ অযুতে মাথার দু'চারটা চুল মসেহ করেছে, কারণ শাফে'ঈ মাযহাবে দু'চারটা চুল মাসেহ করলে ফরয আদায় হয়ে যায়; কিন্তু সে অযু করেছে কুকুরের উচ্ছিষ্ট দ্বারা যা মালেকী মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবে জায়েয নেই। অতঃপর সে নামায আদায় করেছে; তার নামায উক্ত দুই মাযহাবের কোনো মাযহাবমতে ছহীহ হয়নি।

নমুনা-৪

অনুরূপভাবে কোন শাফে'ঈ মাযহাবের লোক মহিলা স্পর্শ করে অযু না করে কোন হানফী মাযহাবের ইমামের পিছনে ইক্তেদা করে নামায পড়েছে । অথচ সে-ব্যক্তির শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল;কিন্তু হানফী না হওয়ায় অযু করেনি। তার নামায উভয় মাযহাব অনুযায়ী ফাসেদ হয়েছে। এধরণে ভূরি ভূরি নমুনা রয়েছে। লিখিত নযীর নমুনাগুলো বুঝার জন্য যথেষ্ট ।

মোদ্দাকথা, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীকে নির্দিষ্ট এক মাযহাবের মুকাল্লিদ হতে হবে। নতুবা আল্লাহ পূজা হবে না বরং সুবিধাবাদী মনপূজা হবে।

নিজ মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে যাওয়া নাজায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ

যেহেতু চার মাযহাবের প্রত্যেকটির বিশেষগুণ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামের সকল বিষয়ে, প্রতিটি ক্ষেত্রে; কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করে, সমস্যাবলীর পূর্ণসমাধানপূর্বক বিরচিত কিতাবসম্ভার; অতঃপর

উম্মতের পরতে-পরতে ব্যাপকহারে সমাদৃত হওয়া। অতএব, যে মুসলমান যে মাযহাবের তাকলীদ করবে তা, তার জন্য যথেষ্ট। সে নিজ মাযহাবের মুফতী ও আলেমদেরকে বা মাযহাবের কিতাবাদি বাদ দিয়ে, অন্য মাযহাবের মুফতীকে জিজ্ঞাস করা কিংবা কিতাবাদি দেখার প্রয়োজন পড়বে না। তাই প্রথমে গৃহীত নিজ মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবের দিকে ধাবিত হওয়া; হয়তো নিজ মনের খায়েশ চরিতার্থ করার জন্য হবে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে–নতুবা বিনা জরুরতে, অহেতুক কাজ করা হবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে উভয়টা বর্জনীয়।

আল্লাহ তা'আলা সূরা মু'মিনূনের শুরুতে বলেছেন,

[قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٢) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٤)] ﴿المؤمنون: ٢ – ٤﴾

"নিশ্চয় সে-সব মুমিন পূর্ণসফলকাম, যারা ভয় ও বিনয়ের সাথে নামায কায়েম করে এবং যারা অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা থেকে বেঁচে থাকে।"

(সূরা মু'মিনূন, আয়াত:১-৩)

তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি নিস্প্রয়োজন কাজ গুনাহ হয়ে থাকে তবে তা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। যেহেতু কোন বিষয়ে নিজের মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব মতে আমল করা, এমন নিস্প্রয়োজন কাজ যা মনপূজার অন্তর্ভুক্ত এবং তাতে মনের খায়েশই কার্যকর, সেহেতু নিজের গৃহীত মাযহাব মতে সকল কাজ সম্পাদন করা এবং নিজ মাযহাবের উপর অটল থাকা নিঃসন্দেহে ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে।

সবার জন্য শরী'আতের সব বিষয়ে নিজ ইমামের তাকলীদ করতে হবে কি না?

এখন প্রশ্ন হলো, যারা চার মাযহাব ও চার ইমাম থেকে যে কোনো এক ইমামের তাকলীদ গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে শরী'আতের প্রত্যেক হুকুমের ব্যাপারে উক্ত ইমামের তাকলীদ করতে হবে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে যে, চার ইমামের প্রত্যেকে মুজতাহিদে মুতলক ও মুস্ত াকিল অর্থাৎ প্রত্যেকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম ও বাতেনী স্বতন্ত্র শক্তির বলে সোজাসুজিভাবে কোরআন ও হাদীছ থেকে গবেষণা করে ইজতিহাদের উসূলসমূহ কায়েম করেছেন। তাঁদের যারা তাকলীদ করেছেন সবাই ইজতিহাদে অক্ষম নন; বরং অনেক ইজতিহাদে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ ও মুহাদ্দিছ

তাঁদের তাকলীদ করেছেন। তবে তাদের ইজতিহাদী শক্তি মূল ইমামের শক্তি থেকে কম, তাই তারা ইজতিহাদে পূর্ণ শক্তির অধিকারী মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। যে-সমস্ত মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করেছেন তারা কয়েকভাগে বিভক্ত। এর তাফসিলী আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; তবে এতটুকু জেনে রাখা উচিত যে, মুকাল্লিদ দুইপ্রকার

১. সাধারণ মুকাল্লিদ অর্থাৎ যারা ইজতিহাদে অক্ষম।

২. মুজতাহিদ মুকাল্লিদ।

সাধারণ মুকাল্লিদের জন্য প্রত্যেক শরয়ী আহকামে নিজের ইমামের তাকলীদ করা জরুরী কিন্তু মুজতাহিদ মুকাল্লিদ প্রত্যেক হুকুমে ইমামের তাকলীদ করতে বাধ্য নন।

সাধারণ মুকাল্লিদ কারা এবং তাদের করণীয় কি?

সাধারণ মুকাল্লিদের উপর শরী'আতের মাসআলার ব্যাপারে নিজ ইমামের ইজতিহাদী রায় মুতাবেক তাকলীদ করে আমল করা ওয়াজিব। সাধারণ মুকাল্লিদ বলতে বুঝায়, যারা কোরআন-হাদীছ বুঝে না অথবা বুঝলেও ইজতিহাদে অক্ষম। এ-যুগের মুহাদ্দেছ-মুফতী ও মাওলানা-মৌলভীরাও সাধারণ মুকাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত।

মোদ্দাকথা, প্রতিটি মাসআলাতে বে-ইলম লোক ও এ-যুগের প্রত্যেক আলেমের উপর এক ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব। কিন্তু মুজতাহিদ মুকাল্লিদদের জন্য সবব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মুজতাহিদ মুকাল্লিদগণের নিজ ইমামের সাথে মতানৈক্য : একটি সার্বজনীন উদাহরণ

মুজতাহিদ মুকাল্লিদগণ যেহেতু নিজ ইমামের উসূলসমূহের অনুকরণ করে তাকলীদ করেছেন তাই তাঁদেরকে মুকাল্লিদ বলা হয়। তবে তাদের জন্য প্রত্যেক শাখা মাসআলাতে নিজ ইমামের তাকলীদ করা জরুরী নয়। যেমন, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শাগরেদ ও মুকাল্লিদ ইমাম আবু ইউসুফ রাহ., ইমাম মুহাম্মদ রাহ., ইমাম যুফর রহ. প্রমুখ। তাঁরা যদিওবা নিজ ইমামের উসূল মুতাবেক ইজতিহাদ করতেন, তাসত্ত্বেও অনেক ইজতিহাদী খুঁটিনাটি

মাসায়েলে ইমাম ছাহেবের সাথে তাঁদের মতানৈক্য ছিলো। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার । যেমন, যেসব উকীল কোনো বড় উকিলের নিকট অবস্থান করে, তাঁর শিক্ষানুযায়ী উকালতী প্র্যাকটিস করেন, অতঃপর কিছুদিন পরে দেখা যায়, একই মুকাদ্দমায় উস্তাদ উকিল ও শিষ্য উকিল দুইজন দুই বাদী-বিবাদী মুয়াক্কেলের উকিল হয়ে কোর্টে হাকীমের সামনে দু'জন দু'ধরণের মতপ্রকাশ করে থাকেন। কারণ, উপস্থিত মুকাদ্দমার ঘটনা আইনের কত নং ধারাতে অন্ত র্ভুক্ত হলো তা রিসার্চ করে বের করতে হয়, তাই তাতে দ্বিমত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। অনুরূপ ইজতিহাদী মাসআলাসমূহতে মুজতাহিদদের মতানৈক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। যদিও তারা একে অপরের উস্তাদ শাগরিদ হয়ে থাকেন না কেন। এটাই তাঁদের ইখলাছের প্রমাণ বহন করে।

তাকলীদের ব্যাপারে বর্তমান আহলে হাদীছের দাবী এক রকম আর তাদের শীর্ষস্থানীয় আমীরদের দাবী অন্য রকম

তথাকথিত আহলে হাদীছ যেহেতু বাতিল দল এজন্য তারা দাবীর ব্যাপারে অস্থির। তাদের কেউ কেউ বলে সর্ব প্রকারের তাকলীদ শিরক। আর কেউ বলে বিদআত ও হারাম যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তাদের চার নেতৃস্থানীয় আমীর তথা মাও. নযীর হোসাইন সাহেব দেহলবী, মাও. ইব্রাহীম সাহেব শিয়ালকোটি, মাও. ছানাউল্লাহ সাহেব অমৃতসারী এবং মাও. দাউদ সাহেব গজনবী তাদের লিখিত কিতাব 'মিয়ারে হক' পৃষ্ঠা ৪১, তারীখে আহলে হাদীছ পৃষ্ঠা-১২৫, দাউদ গযনবী পৃষ্ঠা-৩৭৫ ফাতওয়ায়ে ছানাইয়্যা ১ম খ. ২৫২পৃ. লিখেছেন, তাকলীদে মুতলক (মুক্ততাকলীদ) ওয়াজিব আর তাকলীদে শাখছী (ব্যক্তিতাকলীদ) তথা এক নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ মুবাহ (জায়েয)। এখন আমাদের দেশের আহলে হাদীছের আচরণে আমরা হতবাক। তারা কথায় কথায় উক্ত চার আমীরের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলে এবং আহলে হাদীছের মিশনকে তাদের অনুকরণে চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। অথচ আমীরদের দাবীর সাথে বর্তমান আহলে হাদিসের দাবীর মোটেই মিল নেই। কারণ, তারা কেউ বলে তাকলীদ শিরক, কেউ বলে বেদআত, হারাম।

উল্লিখিত আহলে হাদীছের আমীরগণ কুরআন হাদীছের দলীলসমূহের উপর গবেষণার পর তাকলীদে মুতলাক অর্থাৎ মুক্ততাকলীদকে ওয়াজিব এবং তাকলীদে শাখছী অর্থাৎ ব্যক্তিতাকলীদকে জায়েয বলতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা মুকাল্লিদগণ ব্যক্তি তাকলীদ অর্থাৎ নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদকে

সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব বলি। আর তারা তা জায়েয বলছেন। আমাদের ধারণা যদি তারা আরো একটু গভীর গবেষণা করতেন তাহলে ব্যক্তি তাকলীদকেও ওয়াজিব বলতে বাধ্য হতেন।

যা হোক, এখন তাদের নিকট তথা তাদের উক্ত মতের অনুসারীদের নিকট প্রশ্ন হল, তাকলীদে মুতলাক (মুক্ততাকলীদ) ওয়াজিব। আর তাকলীদে শাখছী (ব্যক্তিতাকলীদ) মুবাহ (জায়েয)। এ দাবীর পিছনে কোন শরয়ী দলীল আছে কিনা? যদি থাকে প্রকাশ করুন। আমরা দেখছি তার বিপরীত শত শত জ্বলন্ত প্রমাণ শরী'আতে রয়েছে। যেমন, কোরআন ও হাদীছের অনেক অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্থ হয় যে, মুসলমানদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। এটা ইসলামের অকাট্য হুকুম। এটি একটি মুতলক হুকুম (মুক্তহুকুম)। আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান নামক কোন ব্যক্তির উপর ফরয হয়নি। কিন্তু এ মুতলক হুকুমটা মুসলমান ব্যক্তিদের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হয়েছে। দেখুন নামাযের ব্যাপারে শরী'আতে ইসলামের হুকুমটা যেমন মুতলাক (মুক্ত) অবস্থায় ফরয ছিল। তদ্রূপ ব্যক্তিযুক্ত হওয়ার পরও ফরয রয়েছে। অর্থাৎ এমন কোন মুসলমান ব্যক্তি নেই যার উপর নামায ফরয নয়। আলেম, বুজুর্গ, পীর, ওলী, কুতুব, আবদাল, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, সুস্থ-অসুস্থ এবং মুকীম-মুসাফির সর্ব শ্রেণীর মুসলমানের উপর সর্বযুগে সর্বস্থানে, সর্বাবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। এমন কোন ব্যক্তি নেই যার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয নয় বরং তার জন্য নামায পড়া মুবাহ (জায়েয)। তবে পাগল, বেহুশ একেবারে অক্ষম ব্যক্তির ব্যাপারে এবং মাসিক ঋতু ও নিফাস ওয়ালী মহিলাদের জন্য শরী'আতে ভিন্ন হুকুম রয়েছে।

অতএব, তাকলীদে মুতলক ওয়াজিব আর তাকলীদে শাখছী মুবাহ এটা আহলে হাদিসের উল্লিখিত চার আমীরদের পক্ষ থেকে একটা মনগড়া বিধান তৈরী করা হয়েছে যা শরী'আত বিরোধী। তার শত শত প্রমাণ কোরআন ও হাদীছে রয়েছে। নযীর স্বরূপ এখানে একটি পেশ করা হল। তাকলীদে শখছীর অধ্যায় উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের উল্লিখিত বিধান এ যুগের ভণ্ড ফকীর ও পীরদের বিধান। তারা বলে তাদের উপর মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জাহেরী নামায ফরয নয়, তারা বাতেনী নামায পড়ে, আল্লাহর আরশে গিয়ে নামায পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। অথচ ইমামে শরী'আত ও তরীকত, ইমামুল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন যাহেরী নামায পড়েছেন এবং যাহেরী নামাযের তা'লীম দিয়েছেন এবং মৃত্যুর

পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যাহেরী নামায পড়েছেন। শরী'আতের মুতলক হুকুম পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর সমানভাবে ফরয হিসাবেই বাস্তবায়ন হবে। কিছু ভণ্ড পীর ও তাদের অনুসারীরা নিজেদেরকে উক্ত ফরয হুকুমের আওতামুক্ত মনে করে কোরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য ও অকাট্য হুকুমের বিরোধিতা করে জাহান্নামের পথ বেছে নিয়েছে। (নাউযুবিল্লাাহ মিন যালিক)। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন। মোদ্দাকথা, যে হুকুম মুতলক ফরয বা ওয়াজিব তা মুবাহ হওয়ার কোন যুক্তি বা প্রমাণ শরী'আতে নেই।

যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে মুক্তাকলীদ ওয়াজিব ও ব্যক্তিতাকলীদ মুবাহ হওয়ার দাবীর অসারতা প্রমাণ

আহলে হাদীছদের উল্লিখিত আমীরগণ যে বলেছেন, তাকলীদে মুতলক ওয়াজিব, তাকলীদে শাখছী মুবাহ; তার মর্মার্থ হল, চার ইমাম থেকে যে কোন অনির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব আর নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদ করা মুবাহ।

এখন প্রশ্ন হল, সাধারণ লোক (ইজতিহাদে অক্ষম ব্যক্তি) অনির্দিষ্ট যে কোন ইমামের তাকলীদ কিভাবে করবে তার পদ্ধতি কয়েকটি হতে পারে।

১ম পদ্ধতি হলো: যদি বলা হয় এক সাথে চারো ইমামের তাকলীদ করবে তাতো বস্তুত অসম্ভব। কারণ অনেক বিষয় আছে এক ইমাম হালাল বলেন, অন্য ইমাম হারাম বলেন। এক ইমাম নাজায়েয বলেন, অন্য ইমাম ফরয বলেন। যেমন, মাছ ছাড়া পানির অন্যান্য প্রাণী ভক্ষণ করা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে নাজায়েয। আর কোন কোন ইমামের মতে জায়েয। গরু ছাগল ও অন্যান্য হালাল জানোয়ারের প্রশ্রাব ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে অপবিত্র এবং তা পান করা হারাম। আর কোন কোন ইমামের মতে পবিত্র এবং তা চিকিৎসার জন্য পান করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, মুক্তাদির জন্য জামাতে নামাজ পড়া অবস্থায় সূরা ফাতেহা পড়া মাকরুহে তাহরীমি। আর কোন কোন ইমামের মতে তা ফরয। দুই কোল্লার (মটকা) কম পানিতে স্বল্প নাপাক মিশ্রিত হলেও তা অধিকাংশ ইমামগণের মতে অপবিত্র হয়ে যায় তা দ্বারা অযু গোসল জায়েয নেই। কিন্তু ইমাম মালেক রহ. এর মতে যদি অপবিত্র বস্তু দ্বারা পানির রং, ঘ্রাণ, স্বাদ নষ্ট না হয় তাহলে তা পাক। তা দ্বারা অযু গোসল সব জায়েয হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে অযু অবস্থায় মহিলাকে স্পর্শ করলে, তদ্রূপ সরাসরি কোন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে

যায়। কিন্তু অন্য ইমামগণের মতে অযু নষ্ট হবে না। এধরণের শত শত নযীর আছে। এখন এক ব্যক্তি এক বস্তুকে হালালও বিশ্বাস করবে হবে, হারামও বিশ্বাস করবে, জায়েযও বিশ্বাস করবে, নাজায়েযও বিশ্বাস করবে এমন অসম্ভব, যেমন আগুন-পানি এবং আলো-অন্ধকার এক হওয়া।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ঃ ঐ ব্যক্তি চার ইমাম থেকে যে কোন ইমামের মতের সাথে নিজের পছন্দমত আমল করবে। এটার উদাহরণ হবে যেমন, কোন এলাকায় চারজন সর্বরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রয়েছে। এক ব্যক্তি মূর্খ রোগীকে ঐ চার ডাক্তার থেকে নিজের পছন্দমত যে কোন ডাক্তারকে রোগ চিকিৎসার জন্য নির্বাচন করতে পরামর্শ দেয়। অথচ ঐ লোকটার ডাক্তার নির্বাচনের ব্যাপারে কোন জ্ঞানই নেই। তাই সে ডাক্তার নির্বাচনের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগবে। কিছু দিন এক ডাক্তার থেকে ঔষধ সেবন করবে, কিছু দিন অন্য ডাক্তার থেকে ঔষধ সেবন করবে। শেষ পর্যন্ত তার রোগ চিকিৎসা অনিশ্চিত হয়ে যাবে। বরং রোগ আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা প্রবল। উক্ত পদ্ধতিকে মুজতাহিদ ও ফকীহগণের ভাষায় তালফীক তথা সুবিধাবাদ বলা হয়। আর তালফীক হারাম। তার অনেক নযীর তাকলীদে শখছীর অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে উদাহরণস্বরূপ একটি নযীর পেশ করা গেল। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, এক ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ফাসেক অভিভাবক বা ফাসেক সাক্ষীর মাধ্যমে। উক্ত বিবাহ অধিকাংশ ইমামদের মতে জায়েয হয়েছে। কারণ, শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব মতে অভিভাবক বা সাক্ষী দ্বীনদার হওয়া তথা ফাসেক না হওয়া বিবাহ বন্ধনের জন্য শর্ত নয়। উক্ত ব্যক্তি কিছু দিন পর ঐ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকৃত স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর সে বলে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব মতে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অভিভাবক বা সাক্ষী দ্বীনদার হওয়া তথা ফাসেক না হওয়া শর্ত। তাই ঐ মাযহাব অনুযায়ী আমার উল্লিখিত বিবাহ শুদ্ধ হয় নেই। যখন বিবাহই শুদ্ধ হয়নি তাই কোন তালাকও পতিত হয়নি। অতঃপর উক্ত মহিলাকে আবার দ্বীনদার অভিভাবক ও সাক্ষীর মাধ্যমে আমার বিবাহ করা জায়েয হবে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, তার জন্য পরের বিবাহ হারাম হবে। কারণ, সে প্রথমে ফাসেক অভিভাবক ও সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ জায়েয হওয়াটা বিশ্বাস করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। পরে নিজের সুবিধার জন্য উক্ত বিশ্বাস বা আকীদা ছেড়ে

শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেছে। তাই তা হবে মন পূজা, আল্লাহ পূজা নয়। আর তা হবে দ্বীন নিয়ে খেলা করা। তাই তার উক্ত কাজ জয়েয হবে না, হারাম হবে। তিনি আরো লিখেছেন, উক্ত ব্যক্তি যদি বলে আগে ইমাম বুঝিনি, উক্ত মাসআলার ব্যাপারে এখন আমি শাফেয়ী মাযহাবে বিশ্বাসী হলাম, তাহলেও তা হারাম হবে। কারণ, তাও হবে তার স্বার্থপূজা ও মনপূজা। দ্বীনের অনুকরণ নয়। (মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা রহ. খ. ৩২ কিতাবুন নিকাহ পৃ. ৬৬-৬৭)
এ ধরনের আরো অনেক নযীর ঐখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতি হলঃ যে বিষয়ে যে ইমামের রায় কোরআন ও হাদীছ অনুযায়ী প্রাধান্য পাবে সে বিষয়ে সে ইমামের অনুকরণ করা। অন্য ইমামদের রায়ের অনুকরণ না করা। এই পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করার কথা বলা ও শুনা সহজ। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা আসমান ধরার চেয়েও কঠিন ব্যাপার। বরং অসম্ভব। কারণ, কথা চলছে ইজতেহাদে অক্ষম ও সাধারণ ব্যক্তিদের তাকলীদের ব্যাপারে। সাধারণ ব্যক্তিরা সরাসরি কোরআন, হাদীছ বুঝতে অক্ষম। যদিও বুঝতে পারে কিন্তু কোন ইজতেহাদী মাসআলায় কোরআন, হাদীছ অনুযায়ী কোন্‌টা উত্তম আর কোন্‌টা অনুত্তম তা পার্থক্য করার শক্তি তাদের নেই। অতএব, তাদের ক্ষেত্রে দলীলের আলোকে এক ইমামের রায়কে অন্য ইমামের রায়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয় বরং তা কল্পিত কাহিনীর ন্যায় অবাস্তব ও হাস্যকর ব্যাপার। আর যদি বলা হয়, তারা আলেমদের থেকে বা মুফতিদের থেকে জিজ্ঞাসা করে করে দলীলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মাসআলাসমূহের উপর আমল করবে। পূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে এমন মুফতি বা আলেম লক্ষ-কোটির মধ্যে দু'একজনও দেখা যায় না যারা সমস্ত ইজতেহাদী মাসআলার ব্যাপারে সমস্ত ইমামদের রায় সমূহ থেকে কোরআন ও হাদীছের আলোকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত রায়সমূহকে চিহ্নিত করতে পারে এবং উম্মতের জন্য পঞ্চম পদ্ধতি হিসেবে সাজাতে পারে। পূর্বের শত শত মুজতাহিদ মুকাল্লিদরাও এতে সক্ষম হননি।

জানা গেছে, ইমামুল হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী রহ. চারও মাযহাবের দলীলের আলোকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মাসআলাসমূকে একত্রিত করে এক মাযহাবে পরিণত করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু কাশ্‌ফের মাধ্যমে বা ইলহামের মাধ্যমে ঐ ব্যাপারে সক্ষম হবেন না বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি তা হতে বিরত থেকে স্বীয় হানাফী

মাযহাবের উপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অটল থাকেন। যে ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আলেম, বড় মুফতি, বড় মুহাদ্দিছ বরং যুগের মুজতাহিদ ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী রহ. কামিয়াব হন নি। অন্য আলেম উলামারা এ ব্যাপারে সফল না হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

চতুর্থ পদ্ধতি হলঃ যদি অলৌকিকভাবে এই রকম ব্যক্তির অস্তিত্ব মেনে নেয়া যায়, যিনি কোরআন ও হাদীছের আলোকে চার মাযহাবের সমস্ত প্রধান্য দিকগুলোকে একত্রিত করে চার মাযহাবকে এক মাযহাবে পরিণত করতে সক্ষম হন। তাহলে শরী'আতের উসূল এবং যুক্তির চাহিদামতে সারা বিশ্বের মুসলমান ঐ এক ব্যক্তির তাকলীদ করতে বাধ্য হবে। তাহলে সেটাও তো হবে তাকলীদে শাখছী বরং চার ইমাম থেকে কোন ইমামের তাকলীদের চেয়ে এটা হবে আরো পরিপূর্ণ ও উচ্চমাপের তাকলীদে শখছী। আহলে হাদীছ ভাইয়েরা চার ইমাম থেকে এক ইমামের তাকলীদ সহ্য করতে পারেন না। তখন সর্ব ব্যাপারে এক ব্যক্তির তাকলীদ কিভাবে সহ্য করবেন।

মোদ্দাকথা, চার মাযহাবকে একিভূতকরণ আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে। তাকলীদে শাখছী মুবাহ আর তাকলীদে মুতলক ওয়াজিব হওয়ার দাবি সত্যের অপলাপমাত্র, বাস্তবে তা অবাস্তব ও ধোঁকা বৈ কিছু নয়।

চার মাযহাবের ইমামগণ কেন তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করলেন? তার প্রকৃত কারণ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. তার কিতাব মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া ২য় খ: ১১৭ পৃষ্ঠাতে চার মাযহাবের চার ইমামের প্রকাশ্যবাণী নকল করেছেন। বাণীসমূহেতে তাঁরা মানুষকে তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন । এ ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ সংক্ষেপে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বক্তব্য নকল করা হলো। তিনি বলেন, ''আমি ইজতিহাদ করে যে মাসআলা ভালো মনে করেছি, তা লিপিবদ্ধ করেছি। যদি পরে অন্য কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ ঐ ব্যাপারে আমার ফতওয়ার চেয়ে উত্তম পাই তবে তার উপর আমল করবো, আমারটা ছেড়ে দিবো।' অর্থাৎ ঐ সময় আমারটা মানা ওয়াজিব নয়।

চারো মাযহাবের ইমামগণ তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করার এক কারণ হলো, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে অযোগ্য মনে করতেন। দ্বিতীয় কারণ হলো, যে সকল মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ তাঁদের তাকলীদ করতেন, তাদেরকে এমর্মে সতর্ক করতেন যে, আমি ইজতিহাদ করে যে বিষয়ে যে ফায়সালটি

দিয়েছি, আপনারা যদি তার বিপরীত ছহীহ হাদীছ পান; কিংবা আপনাদের ইজতিহাদ মতে আমার ফায়সালার বিপরীত ফায়সালা সাব্যস্ত হয়; তবে আপনারা সেমতে আমল করবেন। এ-ব্যাপারে আমার তাকলীদ করবেন না। চার ইমামকর্তৃক নিজেদের তাকলীদ নিষিদ্ধকরণ তাঁদের অত্যন্ত ইখলাছ, ও পূর্ণযোগ্যতারই প্রমাণ বহন করে। কারণ, তাঁরা একমাত্র দ্বীন কায়েম করার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলাকে রাজি করার উদ্দেশ্যেই ইজতিহাদ করে মাসআলা বলেছেন, মানুষকে খুশি করার জন্য নয়।

ইমাম আবু হানীফা রহ.কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফিকাহবোর্ডঃ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

(এই জন্যই) ইমাম আবু হানীফা রহ. নিজের চল্লিশজন যোগ্য মুজতাহিদ শাগরেদগণের মাধ্যমে একটি ফিকাহবোর্ড কায়েম করেছিলেন। যে কোনো নতুন মাসআলা তাঁদের সবার সামনে পেশ করা হতো। ইমাম ছাহেব বলতেন, কোরআন-হাদীছের আলোকে আপনাদের নিজ নিজ ইজতিহাদী রায় স্বাধীনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। সবাই যখন আপন আপন রায় উপস্থাপন করতেন, তখন ইমাম ছাহেব রহ. ঐ বিষয়ে আখেরী ফায়সালা দিতেন। অধিকাংশ সময় তাঁরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ইমাম ছাহেবের ফায়সালা মেনে নিতেন। আর কোনো কোনো সময় ঐ ব্যাপারে কোনো কোনো শাগরিদ দ্বিমত পোষণ করতেন। দীর্ঘ কয়েকদিন যাবত বহছ ও মুবাহাছা, বিচার-বিশ্লেষণ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। যদি ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব না হত তখন ইমাম ছাহেব বলতেন, লিখ! এই মাসআলাতে অমুক ব্যক্তির দ্বিমত রয়েছে। যেমন, আবু হানীফা রহ. বলেছেন জায়েয, অমুক শাগরিদ বলেছেন, মাকরুহ বা নাজায়েয। আর কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, ইমাম ছাহেব রহ. আলাপ-আলোচনায় শাগরিদের মতকে নিজ মতের উপর প্রাধান্য দিতেন। উল্লিখিত অতিসতর্কতামূলক পদ্ধতিতে মাসআলার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে ইমাম সাহেব তা লিপিবদ্ধ করার হুকুম দিতেন। অতঃপর তাঁর বিশেষ শাগরিদ ইয়াহইয়া ইবনে আবী যায়েদা তা ফতওয়ার দফতরে লিপিবদ্ধ করতেন। উক্ত পদ্ধতিতে ১২১ হি.থেকে ১৫০ হি. পর্যন্ত অর্থাৎ ইমাম আযম রহ. মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর মনোনীত ৪০ জন বিজ্ঞ শাগরিদের ঐকমত্যে মাসআলা লিখিয়েছেন। পরে

মাযহাবের বিভিন্ন ফকীহগণ সেসব মাসায়েলকে কিতাবাকারে উম্মতের খিদমতে পেশ করেছেন। বিশেষকরে ইমাম মুহাম্মাদ রাহ., যিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রথম সারির শাগরিদদের অন্যতম একজন;তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ যেমন: মাবসূত, যিয়াদাত, জামে'য়ে ছাগীর, জামে'য়ে কাবীর, সিয়রে ছাগীর, সিয়রে কাবীরসহ অন্যান্য কিতাবে (باب الطهارة) তাহারত তথা পবিত্রতা অধ্যায় থেকে (باب الميراث) মিরাছ তথা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনবিষয়ক অধ্যায় পর্যন্ত; অর্থাৎ দ্বীনের সকল বিষয়ে, পরিপূর্ণরূপে, মাসায়েলে হানফিয়্যা লিপিবদ্ধ করেছেন।

মোদ্দাকথা, ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. তাঁর চল্লিশজন যোগ্য শাগরিদগণের সমন্বয়ে যে ফাতাওয়া কমিটি গঠন করেন, সেখানে যেমনি ছিলেন হাদীছ-ফিকাহ বিশেষজ্ঞ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেছ ও ফকিহ; তেমনি ছিলেন আরবীসাহিত্য ও ভাষাজ্ঞানে পূর্ণদক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। প্রতিটি সদস্য ছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী, প্রখর প্রজ্ঞায় অতুলনীয়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অসাধারণ। তারা যেমনি ছিলেন, আমল-আখলাক ও স্বভাব-চরিত্রে দৃষ্টান্তহীন; তেমনি ছিলেন ইখলাছ-তাকওয়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তুলনাহীন। তাঁরা পারস্পরিক ইজতিহাদী রায় বিনিময়ের মাধ্যমে দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ এক ঐতিহাসিক খিদমত আনজাম দিয়েছেন। তাঁরা ইসলামী শরী'আতের সর্বদিকে তথা ইবাদাত, মু'আমালাত-মু'আশারাত (চাল-চলন, রীতিনীতি), সিয়াসত (রাজনীতি) ও বিচারবিভাগের সর্বপ্রকারের আইন ও ধারা প্রণয়ন করে সারা বিশ্বের সামনে কিতাব আকারে পেশ করেন; যা ছিলো, সম্পূর্ণরূপে কোরআন-হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈন, তবে-তাবে'ঈনের ইজমা ও রায়সমূহের আলোকে গৃহীত। যা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ রহ., বৃহত্তম ইসলামী রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বহু বছর যাবৎ হাজার হাজার ফয়সালার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অনুরূপ আরো অনেক হানফী মুজতাহিদ বিচারপতিগণ যুগযুগ ধরে শরয়ী বিচারকার্য আঞ্জাম দেন।

হানফী মাযহাবের কিতাবগুলো ইমাম আবু হানীফা রাহ.নিজ হাতে না লিখলেও উল্লিখিত শুরাভিত্তিক দরছের মাধ্যমে এ-মহান কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। এজন্য তাঁর শাগরিদগণ যত কিতাব লিখেছেন এবং তাঁদের উসূল অনুযায়ী পরবর্তী হানফী ফকীহগণ যত কিতাব লিখেছেন, সবগুলোকে হানফী মাযহাবের কিতাব বলা হয়। ইমাম ছাহেবের উল্লিখিত ফিকাহ কমিটির

ব্যাপারটা ইমাম তাহাবী রহ. আসাদ ইবনে ফুরাতের সনদে মুত্তাসিলের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

(মুকাদ্দমা আল মিছবাহুন নূরী শরহে মুখতাছারুল কুদুরী পৃ.১০-১১;ইমাম আবু হানীফা রহ.স্মারকগ্রন্থ পৃ.৪০৪;আকাবিরু আবি হানীফা ওয়া আছহাবিহি, পৃ.১৪৯; তারীখে বাগদাদ খ.১২, পৃ. ৩০৮;আল- জাওয়াহিরুল মুযীআহ, খ.১, পৃ.২৬৭)

অন্যান্য তিন মাযহাবের ইমামগণও শরী'আতের সর্বক্ষেত্রে, সকল বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. যেহেতু তাবে'ঈ ছিলেন সেহেতু আবু হানীফা রহ. এর ইজতিহাদী উসূল ও তার ইজতিহাদী কার্যক্রম এবং তাঁর শাগরিদগণের লিখিত কিতাবসমূহ অন্যান্য ইমামগণের কিতাবাদির অনেক আগেই পৃথিবীজুড়ে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে। এজন্য বাস্তবদৃষ্টিতে জরিপ লাগানো হলে দেখা যাবে, বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানফী মাযহাবের অনুসারী ।

বিশ্বে হানফী মাযহাবের বিস্ময়কর বিস্তৃতি

পূর্বে লিখা হয়েছে যে, চার মাযহাবের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন তাবে'ঈ, বয়সে অন্য তিন ইমামের চেয়ে বড়। কেননা, তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন; ঐ-বৎসরই ইমাম শাফে'ঈ রহ. জন্মগ্রণ করেন; ইমাম মালেক রহ. জন্মগ্রহণ করেন ৯০ হিজরীতে এবং ইমাম আহমদ রহ. ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. ৪০ জন মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ যোগ্য শাগরিদ নিয়ে ফতওয়াবোর্ড গঠন করেন। ১২০ হিজরী থেকে তাদেরকে নিয়ে পরামর্শ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সতর্কতাবলম্বনপূর্বক ইজতিহাদী মাসায়েলের উৎকর্ষসাধন ও লিখনি কার্যক্রমের শুভসূচনা করেন। অতঃপর ত্রিশ বৎসর যাবৎ এ-বৃহৎ ও পুণ্যময় কাজের আঞ্জাম দিতে থাকেন। অপরদিকে তাঁর যোগ্য শাগরিদগণ বিশেষত ইমাম মুহাম্মদ রহ. সে-সব লিখিত মাসআলাসমূহকে কিতাবাকারে লিখে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে প্রচার-প্রসারে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি মদীনা শরীফ, শাম ও উন্দুলুস ইত্যাদি এলাকাতে প্রায় মালেকী মাযহাবের কিতাবাদি মুসলমানদের হাতে পৌঁছেছে; কিন্তু সে যুগে যেহেতু শাফে'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের কোন কিতাব রচিত হয়নি তাই মুসলিম জাহানের অধিকাংশ রাষ্ট্রে মুসলমানগণ দ্বীনী মাসায়েল ও শরয়ী আহকাম, হানফী মাযহাবের কিতাবাদির মাধ্যমেই পেয়েছেন। এ কারণে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের মুসলমান

হানফী মাযহাবের অনুসারী। যেমন: ইরাকের কুফা, বাগদাদ, বসরা, ও মিসর, রোম, তুর্কিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ, ইস্পাহান, আজারবাইজান, জুরজান, মার্গিনান, বুসতাম, ফারগানা, খাওয়ারেযম, কেরমান, ভারতবর্ষ (পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ;) আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, চীন, বার্মা ইত্যাদি বিশ্বের আরো যেসব রাষ্ট্রে মুসলমানরা হানফী মাযহাবের কিতাবাদির মাধ্যমে ইসলামের যাবতীয় আহকাম ও মাসায়েল পেয়েছেন। সুতরাং উপর্যুক্ত রাষ্ট্র এবং আরো যেসব রাষ্ট্রের মুসলমানরা হানফী মাযহাবানুযায়ী আমল করেছেন, তাদের কারো জন্য অন্য কোনো মাযহাবের অনুকরণ করা অযৌক্তিক এবং নিঃসন্দেহে মনপূজা ও নিস্প্রয়োজন কাজের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলভী রাহ.তাঁর ইনছাফ নামক কিতাব ৭১ পৃষ্ঠায় লিখেন, ভারতবর্ষের কোন জায়গা এবং মাওয়ারাউন নাহার এলাকাতে তথা নাহরে জায়হুন যার আওতায় বুখারা, সমরকন্দ ইত্যাদি জায়গা অন্তর্ভুক্ত, এ-সব জায়গার কোনো অঞ্চলে যদি কোনো মালেকী, শাফে'য়ী কিংবা হাম্বলী মুফতী-মুজতাহিদ না আসেন এবং তাঁদের কিতাবাদির প্রচলন না থাকে তবে উপর্যুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ মুসলমানদেরকে হানফী মাযহাবমতে আমল করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় হানফী মাযহাবের তাকলীদ না করে তাকলীদমুক্ত থাকা তথা গাইরে মুকাল্লিদ হিসেবে থাকা তার জন্য হারাম ও না জায়েয।

আহলে হাদীছ আলেমের সাক্ষী দ্বারা হানফী মাযহাব পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত

২৮৮হিজরীতে খলীফা ওয়াছেক বিল্লাহ আব্বাসী কিছু লোককে দুনিয়ার উত্তর রাজ্যে সদ্দে সেকান্দরে বসবাসরত মানুষের অবস্থা জানার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন, সদ্দে সেকান্দরের আশেপাশের সকল পাহারাদার মুসলমান ও হানফী মাযহাবের অনুসারী ও মুকাল্লিদ। হিন্দুস্তানের গাইরে মুকাল্লিদদের আমীর নবাব ছিদ্দীক হাসান ছাহেব মাসালিকুল মামালিকের রেফারেন্স দিয়ে লিখেছেন,

محافظان سد کہ دراں جا بودند ہمہ دین اسلام داشتند و مذہب حنفی وزبان عربی وفارسی می گفتند اما از سلطنت عباسیہ بے خبر بودند

অর্থাৎ সদ্দে সেকান্দরের সকল মুহাফেয তথা পাহারাদার মুসলমান ছিলেন এবং হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন। (রিয়াযুল মুরতায পৃ:৩১৬)

ভারতবর্ষে হানফী মাযহাবের প্রচার-প্রসার

ইতিহাস সাক্ষী, যেসমস্ত মুসলমানগণ ভারত আবাদ করেছেন তারা প্রায় হানফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ভারতবর্ষে সাতশত বছর পর্যন্ত হানফী মাযহাব মতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিলো। বাদশাহ আলমগীর রাহ.এর যুগে বিজ্ঞ মুফতী ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের সমন্বয়ে এবং তাঁদের অবিশ্বাস্য ইলমী ফিকির, মেহনত-মুজাহাদা ও চেষ্টা-সাধনার বদৌলতে রচিত হয় হানফী মাযহাবের ঐতিহাসিক ফতোয়ার কিতাব"ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী/ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া" যা সমস্ত মুসলমানদের জন্য ব্যাপকভাবে আমল করার সুযোগ সৃষ্টিতে বিরল ভূমিকা রাখে। কারণ, হানফী মাযহাবের প্রথম যুগ ও মধ্যমযুগের ফকীহগণের লিখিত ফিকাহ-ফতোয়ার কিতাবাদি ব্যাপকহারে পাওয়া ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর ছিলো।

ভারতবর্ষে হানফী মুহাদ্দিছগণই হাদীছ শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা প্রচার প্রসার করেছেন

যেভাবে হানফী মাযহাবের আলেমগণ ফিকাহ-ফতোয়ার কিতাবাদির মাধ্যমে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে যথাযথভাবে কোরআন-হাদীছ ও ইলমের তা'লীমের মাধ্যমে ঘরে ঘরে দীনের আলো পৌঁছিয়েছেন। তদ্রূপ হানফী ওলামায়ে কেরামই ভারতবর্ষে যথাযথভাবে ইলমে হাদীছের দরসও দিয়েছেন এবং হাদীছের ব্যাপক খেদমতও করেছেন। ভারতের মুসলমানরা তাঁদের থেকেই হাদীছ শুনেছেন, পড়েছেন এবং শিখেছেন। স্বয়ং গাইরে মুকাল্লিদদের বড় আলেম মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম মীর শিয়ালকোটী সাহেব (মৃ:১৩৭৫ হি.) তাঁর লিখিত কিতাব তারীখে আহলে হাদীছের ৩৮৭ পৃ. থেকে ৪২৪ পৃ. এর মধ্যে ভারতে যাঁরা ইলমে হাদীছের খেদমত করেছেন, তা'লীম দিয়েছেন এবং প্রচার-প্রসার করেছেন তাঁদের তালিকা এই ভাবে লিখেছেন ।

১. শায়খ রাজি উদ্দীন ছগানী লাহুরী মৃত: ৬৫০ হি.
২. শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরী রহ. মৃত: ৯৭৫ হি.
৩. শায়খ মোহাম্মাদ তাহের গুজরাটী রহ. মৃত: ৯৮৬ হি.

৪. শায়খ আব্দুলহক মুহাদ্দেছে দেহলভী রহ. মৃত: ১০৫২ হি.
৫. শায়খ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দেদে আলফে ছানী রহ.মৃত: ১০৩৪ হি.
৬. শায়খ নুরুল হক সরহিন্দি রহ. মৃত: ১০৭৩ হি.
৭. শায়খ সৈয়দ মোবারক মুহাদ্দেছে বলগরামী রহ. মৃত.১১১৫ হি.
৮. শায়খ নূরুদ্দিন আহমদ আব্বাসী রহ. মৃত: ১১৫৫ হি.
৯. শায়খ মীর আব্দুল জলিল বলগরামী রহ. মৃত: ১১৩৮ হি.
১০. শায়খ হাজী মোহাম্মদ আফযাল সায়রকোটী রহ.উস্তাদ শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব রহ. মৃত: ১১৪৬ হি.
১১. শায়খ হযরত মির্জা মাযহার জানজানা রহ. মৃত: ১১৯৫হি.
১২. শায়খ ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ.মৃত:১১৭৬ হি.
১৩. শায়খ হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ.মৃত:১২৩৯হি.
১৪. হযরত শাহ রফী উদ্দীন দেহলভী রহ. মৃত:১২৩০ হি.
১৫. শায়খ হযরত শাহ আব্দুল কাদের সাহেব দেহলভী রহ. মৃত: ১২৩০ হি.
১৬. শায়খ হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী রহ. মৃত:১২৪৬ হি.
১৭. উস্তাদুল আফাক শায়খ হযরত শাহ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব দেহলভী রহ. মৃত: ১২৬২ হি.

আল হামদুলিল্লাহ উল্লিখিত মনীষীগণ সবাই হানফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ও অনুসারী ছিলেন। হযরত শাহ ইসমাঈল রহ. সম্পর্কে কোনো কোনো গাইরে মুকাল্লিদ ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন; তিনি নাকি গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন পাক্কা হানফী মাযহাবাবলম্বি। তবে তিনি কিছুদিন রুকুতে যেতে ও উঠতে রফ'এ ইয়াদাইন করতেন। কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন ।

আহলে হাদীছ নামক গাইরে মুকাল্লিদদের জন্মকথা ও উত্থান এবং তাদের নির্লজ্জ বৃটিশ পদলেহন

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ভারতবর্ষের মুসলমানরা হানফী মাযহাবেরই অনুকরণ করে আমল করে আসছেন। কিন্তু আব্দুল হক বেনারসী. (জন্ম ১২০৬ হি.) সে ১২৪৬ হি. থেকে গাইরে মুকাল্লিদিয়্যতের ফিৎনা আরম্ভ করে। ঐ ব্যক্তি প্রথমে আমীরুল মুমিনীন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী রহ. এর দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু তার উক্ত ফিৎনা ও অন্যান্য বেয়াদবীর কারণে তাকে মুজাহিদদের দল থেকে তিনি বের করে দিয়েছিলেন। এ লোকটি প্রকৃত শিয়া ও রাফেজী আকীদার লোক ছিলো। সে বলেছে, হযরত

আয়েশা রা. হযরত আলী রা. সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাই যদি তিনি তওবা না করে থাকেন তাহলে তিনি মুরতাদ হয়ে মারা গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। সে আরো বলেছে যে, ছাহাবাদের ইলম থেকে আমাদের ইলম বেশি। তারা একেকজন পাঁচটা পাঁচটা করে হাদীছ জানতো, পক্ষান্তরে আমরা সবগুলো জানি।

(কাশফুল হিজাব, পৃ.৪২, তরকে তাকলীদ পৃ.৬৭)

মোদ্দাকথা, প্রায় ১২৫০ হি. পর্যন্ত ভারতের মুসলমানরা হানফী মাযহাবের অনুকরণ করেন বরং খাইরুল কুরুন ও তৎসংলগ্নযুগ থেকেই সারা বিশ্বের মুসলমানরা চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ ও অনুকরণ করে শরী'আতের মাসায়েলের উপর আমল করে আসছেন। কিন্তু ১২৪৬ হিজরী থেকে উপরি-উক্ত ফিৎনাবাজ মৌলভী ইমামগণের তাকলীদ করাকে হারাম ইত্যাদি ফতওয়া জারী করে এবং মুহাম্মাদী নামে একটি দল গঠন করে।

পূর্বের আলোচনায় কোরআন-হাদীছ, ইজমা-কিয়াসের অকাট্য দলীল দ্বারা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজতিহাদী আমলের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের যিম্মায় ইজতিহাদ করা ওয়াজিব, অতঃপর ইজতিহাদে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য তাঁদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল ও সমর্থন, খলিফাগণ ও ছাহাবায়ে ইযাম, তাবে'ঈন ও তবে-তাবে'ঈনের আমল সবিশেষ খাইরুল কুরুনের শেষভাগ তথা তবে-তাবে'ঈনের যুগের সমস্ত মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিছিনে কেরামের ইজমা'য়ী আমল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাকলীদে শাখছী ওয়াজিব।

এতগুলো স্পষ্ট দলীলকে উপেক্ষা করে, খাইরুল কুরুনের আমলের বিরুদ্ধাচরণ করে, ইজমাকে পাশ কাটিয়ে উক্ত 'মুহাম্মাদী' নামক দলটি গঠন করে। দলটি অনেকদিন যাবৎ মুহাম্মাদী দল নামে প্রচার-প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে মানুষ তাদেরকে ওহাবী বলা আরম্ভ করে, যে কারণে তৎকালীন বৃটিশ সরকারও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো। কারণ 'মোহাম্মাদী' মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নযদীর দলকে বুঝাতো। বৃটিশদের ধারণা ছিলো, হযরত সৈয়দ আহমাদ বেরলভী রহ. এবং তাঁর মুজাহিদীন সাথীরা সৌদি আরব গিয়ে ঐ দলের নিকট জিহাদী প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। তাদেরকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে বৃটিশ সরকার, সরকারী দপ্তরে তাদেরকে ওহাবী দল হিসেবে লিখে রেখেছিলো। গাইরে মুকাল্লিদদের মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন বাটলভী বৃটিশ সরকারের মন রক্ষার্থে

এবং তাদের থেকে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ১২৯২ হিজরীতে 'আল-ইকতিছাদ ফী মাসায়িলিল জিহাদ' নামক একটি পুস্তিকা লিখে । সেই পুস্তিকার সারমর্ম হলো, জিহাদ মানসুখ তথা জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে, তাই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয হবে না। উক্ত পুস্তিকা লিখে বৃটিশ সরকার থেকে অনেক পুরস্কার পেয়েছে এবং দলের নাম 'মোহাম্মদী দল'এর পরিবর্তে সরকারী দপ্তরে আহলে-হাদীছ লিখার সুযোগ পেয়েছে। (হাশিয়া জঙ্গে আযাদী, পৃ.৩৪; হিন্দুস্তান মে পাহলী ইসলামী তাহরীক পৃ.২১২)

গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব তার লিখিত পুস্তিকা সিরাতে সুনায়ী ৩৭২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন বাটলভী 'ইশা'আতুস সুন্নাহ' পুস্তিকাটি লিখে আহলে হাদীছের অনেক খিদমত করেছে। তার চেষ্টায় বৃটিশ সরকারের দপ্তর থেকে দলের নাম ওহাবী রহিত করা হয়েছে এবং দলের নামকরণ করা হয় 'আহলে হাদীছ'। তিনি সরকারের পক্ষে পুস্তিকা প্রনয়ণ করে সরকারের খিদমত করেছেন। তাই তিনি পুরুস্কারস্বরূপ জমি বন্দোবস্ত পেয়েছেন। পুস্তিকা ইত্যাদি লিখার মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব করার বিনিময়ে ঐসরকারের পক্ষ থেকে 'আহলে হাদীছ' নামটি মঞ্জুর করা হয়। এই অনুমোদনের কিছু দিন পর মাওলানা নজির হোসাইন দেহলভী সাহেব উক্ত নামের মাধ্যমে গাইরে মুকাল্লিদিয়তের ফিতনার আন্দোলন জোরালোভাবে প্রচার-প্রসারের কাজ শুরু করেন। তিনি দিল্লীর হানফী উস্তাদ ও মুহদ্দিছীনে কেরামের রাস্তা ছেড়ে এবং খাইরুল কুরুনের মুজতাহিদীনে কেরাম বিশেষ করে চার ইমামের ইজতিহাদের অনুকরণ ছেড়ে রাফেজী শিয়া আব্দুল হক বেনারসীর অনুকরণ করেছেন এবং নিজের রায়কে মুজতাহিদীনে কেরামের রায়ের উপর প্রাধন্য দেয়ার স্পর্ধা দেখান। তিনি ইমামগণ বিশেষকরে ইমামে আযম আবু হানিফা রহ. এর তুমুল বিরোধিতা করেছেন এবং মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেন। তার সেই ফিতনার আগুনে সারা পৃথিবী দাউ দাউ করে জ্বলছে। সুতরাং মুসলমানদেরকে আপন ঈমান-আমল রক্ষা করার জন্য উক্ত ফিৎনা থেকে দুরে থাকতে হবে।
(হাশিয়া, হায়াতে শিবলী ১ম খ.৩০৮ পৃ: ;আল-কালামুল মুফিদ ফী এছবাতিত তাকলীদ পৃ.১৪২)

'সলফী' 'আহলে-হাদীছ' দাবীর অসারতা; তাদের মুখোশোন্মোচন

এদলটির একাংশ নিজেদেরকে সালফী বলে দাবী করে থাকেন অর্থাৎ তারা সলফের অনুসারী। সলফ বলা হয় প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে তথা খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরাম। আর তাদের এই দাবী মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি বৈ আর কিছুই না। কারণ, গাইরে মুকাল্লিদরা খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের অনেক ইজমা'য়ী আমলের অনুকরণ করে না বরং ঐগুলোকে তারা বিদ'আত ও হাদীছবিরোধী বলে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাদের 'বুঝ' খোলাফায়ে রাশেদীনের বুঝের চেয়ে উত্তম। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফাগণ ও ছাহাবায়ে কেরাম হাদিছ বুঝেন নি, হাদীছ মতে আমল করেননি। (না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তাঁদের পর তাবে'ঈন, তবেতাবে'ঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনও হাদীছ বুঝেননি। একমাত্র সালফী ও গাইরে মুকাল্লিদরাই হাদীছ বুঝেছেন; যেমন বিশ রাক'আত তারাবিহ, এক সাথে তিন তালাক প্রদান ও জুম'আর দ্বিতীয় আযানের ব্যাপারে তাদের ভিন্ন রায় ও মনোভাব। নিজেদেরকে তারা সালফী ও আহলে হাদীছ বলে অথচ সলফের বিরোধিতা করাই যেন তাদের একমাত্র প্রধান কাজ, যা পক্ষান্তরে ছহীহ হাদীছসমূহের বিরোধিতা, যার বিশদ আলোচনা পূর্বে বিস্তারিত লিখা হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হলো, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের উপর হুকুম জারি করেছেন যে, তারা যেন ইখতিলাফ ও বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে অনুকরণ করে সঠিক ফয়সালা বুঝে নেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথম তিন যুগ হলো উত্তম যুগ; উক্ত তিন যুগের উম্মতের ইজমা'ঈ আমল হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য সনদ। গাইরে মুকাল্লিদদের তুলনা হলো ঐ কুচকুচে কালো ব্যক্তির সাথে যার নাম রাখ হয় লাল মিয়া। সালফবিরোধীদের নাম হলো সালফী;হাদীছবিরোধীদের নাম হয়ে গেলো আহলে হাদীছ।

মোদ্দাকথা, উক্ত বিদ'আতী দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হক বেনারসী ছিলো জঘন্যতম শিয়া ও রাফেজী আকিদার লোক। তার অনুসারী সমস্ত গাইরে মুকাল্লিদরা হলো, শিয়াদের ন্যায় খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম,

তাবে'ঈন, তবে-তাবে'ঈন ও মুজতাহিদগণকে ঘৃণাকারী ও তাঁদের বিরুদ্ধাচরণকারী একটি জঘন্যতম দল। তাই তারা পরোক্ষভাবে শিয়া। তাদেরকে শিয়া বলাটা অতিরঞ্জিত হবে না, তদুপরি তা উপরের আলোচনাতে তাদের দলীয় লোকের পুস্তক দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। জিহাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব করার মাধ্যমে সরকার থেকে আহলে হাদীছ নামটি মাঞ্জুর করে নেয়। এখন সংক্ষেপে তাদের দু'টি বাস্তব পরিচিতি উন্মোচিত হয়; তারা হলো শিয়া ও বিদ'আতি এবং বৃটিশ সরকার তথা খ্রিস্টানদের দালাল, পাচাটা গোলাম।

তবে বর্তমানে যেসব সলফীগণ খোলাফায়ে রাশেদীন,ছাহাবায়ে কেরাম ও মাযহাবের ইমামগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কথা বলেন আর আকিদা ও আমলেও শিয়া-রাফেযীদের বিরোধিতা করেন তাদের ব্যাপারে হুকুম হবে ভিন্ন।

আমার আহ্বান

তাদের প্রতি আমার আহ্বান হলো, তারা যেন খালেছ নিয়তে তাওবা করে চার ইমামের তাকলীদ করে। ধর্মের নামে ধোঁকাবাজি ছেড়ে দেন এবং সবচেয়ে উত্তম উম্মত ছাহাবায়ে কেরাম, অতঃপর তাবে'ঈন, তবে তাবে'ঈন বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন হযরাতের উপর পূর্ণ ভক্তি-বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করেন এবং তাদের ইজমা'য়ী আমল শরী'আতের অকাট্য দলিল হিসেবে মেনে নেন, অতঃপর শরী'আতে ইসলামীর বাস্তব আকিদা ও আহকাম গ্রহণপূর্বক আমল করেন।

সমস্ত মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার আকুল আবেদন হলো- তারা যেন ১২৪৬ হিজরীর নবাবিষ্কৃত উক্ত বেদ'আতি ও শিয়া আকীদা ওয়ালা তথা কথিত আহলে হাদীছ দল থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন।

ছাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামের সমালোচনা থেকে বিরত থাকুন

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, বে-ইলম বা কমইলম সরলমনা মুসলমান যখন তাদের ধোঁকার জালে আটকা পড়ে তখন থেকে তারা বেআদব হয়ে যায়। কারণ, তাদের প্রধান কাজ হলো, খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের সমালোচনা করা। বিশেষকরে হযরত ওমর রা. ও হযরত উছমান রা. এর শানে তারা কটূক্তি করে। তাঁরা নাকি হাদীছবিরোধী কাজ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তাবে'ঈন, তবে-

তাবে'ঈন, বিশেষতঃ চার ইমাম যাঁদের ইমাম আবু হানীফা রহ. তাবে'ঈ ছিলেন। তাঁদের তালীম-তরবিয়ত, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, ইজতিহাদ-ইস্তিম্বাত ও বিচার-বিশ্লেষণ সবই ছিলো পরিপূর্ণ কোরআন-হাদীছ মুতাবেক। তবুও তারা এসব পূতপবিত্র হিরন্ময় মনীষীদের সমালোচনায় মুখর, যেন তাদেরকে একাজে কেউ ভাড়া নিয়েছেন। বিশেষকরে তারা ইমামে আযম আবু হানীফা রহ. এর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ ইমামুল মুহাদ্দিছীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ., ইমাম ওয়াকি ইবনে জাররাহ রহ., ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ আল কাত্তান রহ., ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মু'ঈন রহ. ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া রহ.প্রমুখ তাঁর মুকাল্লিদ ছিলেন। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ঐ যুগের ইমামুল হাদীছ, ইলমে হাদীছের প্রাণকেন্দ্র ও তবে তাবে'ঈন; এতদসত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন একবাক্যে ইমাম আবু হানীফা রহ.এর মুকাল্লিদ এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.এর মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করতেন। যার তাফসীলী দলীলসহ আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা, ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন যুগের সমস্ত বড় বড় মুহাদ্দিছগণের ইমাম ও উস্তাদ। অথচ গাইরে মুকাল্লিদরা বলে, ইমাম আবু হানীফা হাদীছ জানেন না। তারা ইমাম সাহেব ও তাঁর অনুসারীদের সমালোচনা না করলে এবং সাড়ে বারশত বছরের হাজার হাজার আলেম মুহাদ্দিছ, মুফতী ও চার মাযহাবের কোটি কোটি মুকাল্লিদ মুসলমানদেরকে মুশরিক, বিদ'আতী ও ভ্রষ্ট ইত্যাদি না বললে তাদের গাইরে মুকাল্লিদিয়্যতের সবক পুরা হয় না। কোটি কোটি মাখলুক সূর্যের আলো দ্বারা উপকৃত হয়, তাই সূর্য উদয় হওয়ার সাথে সাথে তারা আনন্দে ভেসে যায়, কিন্তু বাদুড় সূর্যের উপর অসন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এ বিদ'আতি দলটিও বাদুড়ের ন্যায়, সাড়ে বারোশত বছরের মুসলমানদের ইজমা'য়ী ও ঐক্যবদ্ধ আমল তাদের পছন্দ হয়না। দু'আ করি আল্লাহ পাক তাদেরকে ছহীহ বুঝ দান করুন এবং মুসলমানদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হিফাযত করুন।

ইমামদের তাকলীদকে মূর্তিপূজারীদের তাকলীদের সাথে তুলনাকারী ও শরয়ী কিয়াসকে 'শয়তানের কাজ'আখ্যাদাতাদের দাতভাঙ্গা জবাব

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মূর্তিপূজা বন্ধ করে এক মা'বুদে বর হকের উপর ঈমান এনে, তাঁর ইবাদত

করার প্রতি দা'ওয়াত দিয়েছেন তখন তারা প্রতিউত্তরে বলে, আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে মূর্তিপূজা করতে দেখেছি তাই আমরা তাদের তাকলীদ করে চলবো। মূর্তিপূজারীদের উক্ত তাকলীদ প্রকাশ্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনপাকে উক্ত তাকলীদকে কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আদম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য আল্লাহ পাক যখন ফেরেশতাগণকে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন, ইবলিস শয়তান ছাড়া সবাই হুকুম পালন করেছেন। কিন্তু ইবলিসে লা'ঈন ঐ হুকুম পালন করেনি। বরং আল্লাহপাক তার কারণ জিজ্ঞাসা করার পর সে কিয়াস বা যুক্তি পেশ করে বলেছে, আদম আলাইহিস সালাম হলো মাটির তৈরী, আর আমি হলাম আগুনের তৈরী; আগুন উপরে থাকে, আর মাটি থাকে সবসময় নিচে;তাই উপরওয়ালা নিচওয়ালাকে সিজদা করা অযৌক্তিক। তার উক্ত কিয়াস ছিলো, আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য হুকুম বিরোধী। তাই তার উক্ত কেয়াসের কারণে সে আজীবনের জন্য অভিশপ্ত ও মালউন হয়ে গেছে; অতঃপর তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও কিয়াস; অতঃপর ইজতিহাদে অক্ষম কিংবা কম ক্ষমতাওয়ালা ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে মুজতাহিদগণের তাকলীদ, বিশেষ করে তাকলীদে শাখছী ছিলো আল্লাহ পাক এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পালন করার জন্য। যার বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা কুরআন-হাদীছ ও খায়রুল কুরুনের আমল দ্বারা অকাট্যভাবে পেশ করা হয়েছে। আর এটাও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, যে-সকল ব্যাপারে ওহী নাযিল হয়নি; সে-সব ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিম্মাতে ইজতিহাদ করে ফায়সালা দেয়া ওয়াজিব ছিলো। তাই অনেক ব্যাপারে তিনি ইজতিহাদ করে ফায়সালা দিয়েছেন এবং সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম হুযুর ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সব ফায়সালা মতে আমল করেছেন। যার কিছু নমুনা উপরে পেশ করা হয়েছে। এতো প্রকাশ্য ও অকাট্য দলীল থাকা সত্ত্বেও যারা মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও কিয়াসকে কাফেরদের তাকলীদ ও ইবলিসের কিয়াসের সাথে তুলনা করে; মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও কিয়াসকে শিরক ও শয়তানের কাজ, বিদ'আত ও হারাম ইত্যাদি বলে, তারা কুরআন-হাদীছ তথা ইসলাম ধর্মের জঘন্যতম শত্রু এবং মারাত্মক ধোঁকাবাজ। সরলমনা মুসলমানদেরকে হাদীছের দোহাই দিয়ে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদেরকে ঐব্যাপারে প্রকাশ্য তাওবা করে তাকলীদের রাস্তা গ্রহণ করতে হবে এবং সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে

তাদের ধোঁকা থেকে বেঁচে সমস্ত মুহাদ্দিছীনে কেরাম ও মুজতাহিদীনে ‘ইযাম এবং ইসলামের প্রথম তিন যুগের অনুকরণ করে যেকোন এক মাযহাবের তাকলীদ করে চলতে হবে।

আহলে হাদীছদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ বোখারী ও মুসলিম ইত্যাদির হাদীছ ছহীহ হওয়াটা কোন হাদীছ বা কোন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত?

আহলে হাদীছ ভাইদের দাবী হলো; তারা কোরআন ও ছহীহ হাদীছ ছাড়া শরী‘আতের আর কোনো দলীল গ্রহণ করবেনা। আর তাদের মতে একমাত্র বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীছগুলোই ছহীহ, অন্য কিতাবের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। এখন তাদের নিকট প্রশ্ন হলো, এ-যদি হয় তাদের দাবী তাহলে কোরআনের কোন আয়াতে, কিংবা রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ ছহীহ হাদীছে আছে যে, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর লিখিত কিতাবদ্বয় বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীছগুলো সব ছহীহ, অথবা অমুক অমুক মুহাদ্দিছের লিখিত অমুক অমুক হাদীছগুলো ছহীহ নতুবা তাদের নিকট কি আসমান থেকে সরাসরি ওহী নাযেল হয়েছে যে বোখারী-মুসলিম ও অমুক অমুক মুহাদ্দিছের লিখিত অমুক কিতাবের হাদীছ গুলো ছহীহ। এ-প্রশ্নের উত্তর কি তারা দিতে পারবে? আমি নিশ্চিত তারা কিয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবে না।

বোখারী শরীফ অধিক ছহীহ সাব্যস্ত হয়েছে ইজতিহাদী উসূল ও কড়া শর্তাবলীর আলোকে

সমস্ত ছহীহ হাদীছগুলো মুহাদ্দিছীনে কেরামের উসূলের আলোকেই ছহীহ সাব্যস্ত হয়েছে। তবে বোখারী শরীফ অন্য হাদীছের কিতাবের তুলনায় অধিক শুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, ইমাম বোখারী রাহ.কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করে হাদীছ গ্রহণ করার জন্য কিছু উসূল ও মূলনীতি তৈরী করেন। সেসব মূলনীতির আলোকে রাবী তথা বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে ইমাম বোখারী রাহ.কর্তৃক প্রণীত উসূল ও মূলনীতিগুলো অন্যান্য ইমামদের উসূলের চেয়ে অত্যন্ত নিঁখুত, শক্তিশালী, মযবুত ও সতর্কতামূলক ছিলো। কড়া শর্তাবলির ভিত্তিতে হাদীছ নির্বাচন করার কারণে

য'ঈফ তথা দুর্বল ও সন্দেহজনক রাবী প্রায় বাদ পড়ে যান। এজন্যই উম্মতের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বোখারী শরীফের হাদীছসমূহকে ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে অন্য হাদীছগ্রন্থের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মুহাক্কিক আলেমদের নিকট তাঁর কিতাব অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে উম্মতের সমস্ত লোকের নিকট বোখারী শরীফ ছহীহ কিতাব হিসেবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

মোদ্দাকথা, ইমাম বোখারী রহ. সংকলিত বোখারী শরীফের হাদীছগুলো ছহীহ হওয়াটা কোন আয়াত কিংবা হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি; বরং তাঁর ইজতিহাদী উসূলসমূহের আলোকে, কড়া শর্তাবলীর ভিত্তিতে হাদীছ নির্বাচন ও সংকলনের কারণে তাঁর চয়নকৃত হাদীছগুলো উম্মতের নিকট এতো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ছহীহ হাদীছ নির্বাচন করার ব্যাপারে ইজতিহাদী উসূল মানা আর শরী'আতের মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদী রায় না মানা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না

উপরের বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, মুহাদ্দিছীনে কেরাম কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করে ছহীহ হাদীছ নির্বাচনের ব্যাপারে উসূল নির্ধারণ করেছেন। উক্ত উসূল মোতাবেক হাদীছ বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিছীনে কেরামের গৃহীত উসূল উম্মতের সর্বমহলের উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন অথচ তাদের উস্তাদ বা উস্তাদের উস্তাদ চার মাযহাবের চার ইমামগণ কোরআন হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করে উসূলে ফিকাহ তৈরী করেছেন। আর উক্ত উসূল মোতাবেক শরী'আতের যাবতীয় মাসআলা বলেছেন, লিখেছেন ও লিখিয়েছেন। এখন যারা মুহাদ্দিছীনে কেরামের ইজতিহাদী উসূলকে সাদরে গ্রহণ করেছেন কিন্তু মুহাদ্দিছীনে কেরামের উস্তাদের উস্তাদ মুজতাহিদীনে কেরামের গৃহীত উসূলে ফিকাহকে মানতে তাদের চরম আপত্তি এবং ঐগুলো মানা বা তাকলীদ করার ব্যাপারে তাদের শিরক বিদ'আতের ফতোয়া তাদের জঘন্য মূর্খতারই প্রমাণ।

সারা বিশ্বের মুসলমান হাদীছের ব্যাপারে ইমাম বোখরী রহ. এর তাকলীদে শাখছী করছে

যেহেতু কোরআন শরীফের কোনো আয়াত বা ছহীহ কোনো হাদীছ দ্বারা বোখারী শরীফ কিংবা মুসলিম শরীফ কিংবা অন্য কোনো হাদীছের কিতাবের

হাদীছগুলো ছহীহ হওয়ার প্রমাণ নেই বরং ইমাম বোখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.গণের ইজতিহাদী রায়ের দ্বারাই হাদীছগুলো ছহীহ সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা সর্বমহলের আলেম ও সকল মুসলমান মেনে নিয়েছেন। তা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেলো যে, মুকাল্লিদ ও গাইরে মুকাল্লিদ সর্বমহলের ঈমানদার হাদীছের ব্যাপারে ইমাম বোখারী রহ.এর তাকলীদে শাখছী করছে। তাই আশ্চর্যের বিষয় হলো, গাইরে মুকাল্লিদ আহলে হাদীছরা ইমাম বোখারী রহ. এর তাকলীদ শাখছী জায়েয বরং জরুরী মনে করছে অপরদিকে মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদকে শিরক, বিদ'আত, হারাম ইত্যাদি বলছে। অথচ চার ইমাম, ইমাম বোখারী রহ. এর উস্তাদ এবং উস্ত াদদের উস্তাদ। এটা তাদের একগুঁয়েমী ছাড়া কিছুইনা।

তাই সর্বমহলে মুসলমান ভাইদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন এই প্রতারক ও ধোঁকাবাজদল থেকে বেঁচে থাকেন ও দূরে থাকেন এবং তাদের খপ্পরে যেন না পড়েন।

পরবর্তী আয়োজন

কুরআন হাদীছ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে

তথাকথিত আহলে হাদীছের বিতর্কিত বিষয়সমূহের সমাধান

ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর তথাকথিত আহলে হাদীছের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিতর্কিত বিষয়সমূহ, যেমন, তারাবীহ নামাযের রাকআতসংখ্যা, রুকুর আগে ও পরে হাত উঠানো, উঁচু স্বরে আমীন বলা, কুক্তাদীর কিরাত পড়া ইত্যাদির উপর বিস্তারিত দলীলসমৃদ্ধ বই প্রকাশিত হবে।

ইজমা শরী'আতের দলীল

যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿البقرة: ١٤٣﴾

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে (পূর্বের চরম ও নরম দুই উম্মতের চেয়ে) মধ্যপন্থি তথা ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত হিসেবে পাঠিয়েছি, যাতে তোমরা সমস্ত মানুষের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানকারী হও।" (সূরা বাকারা-১৪৩)

وقوله تعالى:[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ] ﴿آل عمران: ١١٠﴾

"(আল্লাহ পাকের ইলমে) তোমরাই ছিলে সর্বোত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ প্রদান করবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা আল-ইমরান ১১০)

وقوله تعالى : [وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا] ﴿النساء: ١١٥﴾

"হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে থাকে, আমি তাকে সে দিকেই নিয়ে যাব যে দিকে যাওয়া সে পছন্দ করে এবং জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিব এবং তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।" (সূরা নিসা- ১১৫)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথে চলা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। তা দ্বারা বুঝা গেল শরী'আতের কোন ব্যাপারে যদি আহলে ইলম ও মুজতাহিদ ঈমানদারগণ ঐকমত্য পোষণ করেন তা শরী'আতের অকাট্য দলীলে পরিণত হবে। তাই যে কোন ব্যক্তির জন্য যেভাবে রাসূলের বিরোধিতা তথা কুরআন হাদীছের বিরোধিতা হারাম হবে, তদ্রূপ তার জন্য ইজমার বিরোধিতাও হারাম হবে। নতুবা ঈমানদারদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলার উপর ভিত্তি করে জাহান্নামের ঘোষণা দেয়া হতো না। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মা'আরিফুল কুরআনে ঘটনা নকল করেছেন, এক ব্যক্তি ইমাম

শাফেয়ী রহ.কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইজমা ইসলামী শরী'আতের দলীল হওয়ার ব্যাপারে কুরআন মজীদে প্রমাণ আছে কিনা? তিনি এ প্রশ্নের পর বিরামহীন ভাবে তিন দিন এইভাবে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করেন যে, প্রত্যেক দিন তিন খতম করেন। অতঃপর ইজমার দলীল হিসেবে উক্ত আয়াতটি তাঁর মনে স্থির হয়েছে। পরে তাঁর মতটি তৎকালীন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট পেশ করেন, সবাই ঐকমত্যে তা ইজমার দলীল হিসাবে মেনে নিয়েছেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে এই উম্মতকে মধ্যমপন্থী, মানবজাতির ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সূরায়ে আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাহাবায়ে কেরামের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে পরামর্শ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তা দ্বারা বুঝা যায় দ্বীনের যে কোন কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ দেয়ার যোগ্যতা ও শক্তি ছাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। সূরা শূ'আরা ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴿الشورى: ٣٨﴾

তাদের তথা ঈমানদারদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। (সূরা শুরা, আয়াত: ৩৮)

উক্ত আয়াতে তৎকালীন ঈমানদার অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরামের অনেক গুণাবলী বয়ান করা হয়। তন্মধ্যে তাদের পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুসলমানদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাজসমূহ আঞ্জাম দেয়ার জন্য কার্যকর মূলনীতি হল পরামর্শ করা। আল্লাহ পাক চাইলে সকল বিষয়ে অহীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন। তারপরও অনেক বড় বড় বিষয়সমূহে অহী নাযেল করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঐ সব ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণমূলক তৈরী করেছেন। যাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়সমূহের ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিপূর্ণ

মন-মানসিকতা ও দক্ষতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা ও তাঁর মুবারক সোহবতের বরকতে বাস্তবে তাদের ভিতর যাবতীয় ব্যাপারে শুরার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার মন-মানসিকতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। এই জন্য তাদের উক্ত গুণ কুরআনে পাকের উল্লিখিত আয়াতে কারীমাতে প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বীনি আহকামের ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকেই ইজমা বলা হয়। তাই সূরায়ে শু'আরার উল্লিখিত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল, ইজমা শরী'আতের দলীল। তবে যারা পরামর্শ করে শরী'আতের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন তারা উপরে আয়াতসমূহে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। যেমন ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থী ও সর্বশ্রেষ্ট উম্মত হওয়ার যোগ্যতা এবং সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজের নিষেধ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। তাই পরামর্শ দাতাগণ ইলমে পারদর্শী ও দ্বীনদার পরহেযগার ব্যক্তি হতে হবে। এ কারণেই উসূলের কিতাবে ইজমার সংজ্ঞা এ ভাবে লিখা হয়েছেঃ

الإجماع اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر واحد على أمر قولى او فعلى

অর্থাৎ শরী'আতের দৃষ্টিতে ইজমা বলা হয় দ্বীনের কোন কথা বা কাজের ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেক আমল, নেক আক্বীদাওয়ালা একই যুগের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ করা। যেহেতু ইজতেহাদে অক্ষম ও সাধারণ মুসলমানরা যদি দ্বীনের কোন বিষয়ে ঐকমত্যে কোন ফয়সালা প্রদান করে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, তাদের ফয়সালা ইলম ও দলীল ভিত্তিক হবে না। এজন্যই ইজমার সংজ্ঞাতে মুজতাহিদগণের ঐক্যের শর্ত দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু যারা আক্বীদাগত বা আমলগত বেদা'আতী ও ফাসেক তারা যদি শরী'আতের কোন ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন প্রকারের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাও কবুল করা হবে না যেমন শিয়াদের ইজমা। কারণ, তাদের ঐ সিদ্ধান্ত হবে মনের খাহেশ ও চাহিদা ভিত্তিক। এজন্য সংজ্ঞার মধ্যে বলা হয়েছে তারা আমলে ও আক্বীদায় নেককার দ্বীনদার হতে হবে। আর যেহেতু যাদের মাধ্যমে ইজমা হবে তাদের ঐক্যবদ্ধ মত সাব্যস্ত হতে হবে, তাই ইজমার সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে-একযুগের মুজতাহিদগণের মাধ্যমেই ইজমা গঠিত হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ছাহাবায়ে কেরাম রা.এর পক্ষ থেকে ইজমার বিভিন্ন ঘটনা।

আবু বকর রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমা:

হযরত আবু বকর রা. এর খিলাফত সমস্ত ছাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যার তাফসীল মোল্লা আলী ক্বারী রহ.লিখিত শরহে শামায়েল ২য় খ. ২১৯পৃ., নাসাঈ শরীফ, মুসনাদে আবু ইয়ালী, মুসতাদরাকে হাকীম ইত্যাদি কিতাবে অনুরূপভাবে বেদায়া-নেহায়া ৫ম খ. ২৪৮পৃ. ও তারীখে উম্মত খেলাফতে রাশেদা ৯৪পৃ. সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে অত্র পুস্তকের তাকলীদে শাখছী ছাহাবায়ে কেরামের যুগে" শিরোনামে উল্লিখিত ইজমার ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। তদ্রূপ পরবর্তী তিন খলীফার খেলাফতও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

ওমর রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমা

হযরত আবু বকর রা. শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় যখন জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যান তখন মুহাজির ও আনসারথেকে মুজতাহিদ ও শীর্ষস্থানীয় সঠিক রায়ের অধিকারী ছাহাবায়ে কিরামকে তাঁর সামনে ডেকে আনেন এবং নিজের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে তা উল্লেখ করেন। তারপর কেমন ব্যক্তি খলীফা হবেন তার কিছু বুনিয়াদী বৃহত্তম গুণাবলী উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন, ঐ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র উমর রা.কে দেখছি। তাই আমার পরে উমর রা. কে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করতে চাই; আপনাদের মতামত কি? এই ব্যাপারে অনেক্ষণ আলোচনা-পর্যালোচনার পর উপস্থিত সমস্ত জলীলে কদর ছাহাবায়ে কিরাম হযরত আবু বকর রা. এর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে ওমর রা. এর খেলাফত মেনে নেন। তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবরের আদেশক্রমে হযরত উসমান রা. খেলাফতনামা লিখেন। উক্ত খেলাফতনামাতে লিখেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে ওমর রা. কে খলীফা নির্বাচন করলাম। হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা! আমার পর ওমরের অনুসরণ ও অনুকরণ তোমাদের উপর ফরয। তাছাড়া উক্ত খেলাফতনামাতে অনেক সারগর্ভ ও জরুরী নসীহত লেখিয়েছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রয়োজন মনে করি না। খেলাফতনামা লিখার পর হযরত আবু বকর রা. তাতে সীল মোহর ও দস্তখত দেন এবং তা উপস্থিত সকলকে শুনিয়েছেন। অপর

দিকে মদীনার সর্বশ্রেণীর মুসলমানরা হযরত আবু বকর রা. এর গৃহের সামনে জমায়েত হন। হযরত আবু বকর রা. এক ব্যক্তির সহায়তায় বালাখানার উপরে উঠেন এবং সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। মুসলমান ভাইয়েরা! আমি নিজের ভাইকে খলীফা নির্বাচন করিনি। আমি ওমরকে খলীফা নির্বাচন করেছি। ওমর রা. তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তোমরা কি আমার এই নির্বাচনের ব্যাপারে রাজি আছ? উপস্থিত সকল মুসলমানগণ বললেন, আমরা আপনার এই নির্বাচনকে সাদরে গ্রহণ করলাম। মোদ্দাকথা, সর্বস্তরের মুসলমানগণ ওমর রা. এর খেলাফতের বয়াত গ্রহণ করেন। (তারীখে উম্মত খেলাফতে রাশেদা ২০৫পৃ. হায়াতে ফারুকে আযম ১১৬পৃ. ।)

হযরত উসমান রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমাঃ

হযরত ওমর রা. ২৭ জিলহজ্ব ২৩ হিজরী বুধবার ফজর নামাযে কুখ্যাত কাফের আবু লুলুকর্তৃক মারাত্মকভাবে আহত হন। তখন মদীনার মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত করুণরূপ ধারণ করে। সকলের চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হতে থাকে। তারা যেন নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে যান। ঐ অবস্থায় তারা ফারুকে আযমের চিকিৎসার জন্য যত প্রকার তদবীর আছে সকল প্রকারের চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁর জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। তখন মুজতাহিদ ও শীর্ষস্থানীয় ছাহাবায়ে কিরাম হযরত ফারুকে আযমের নিকট দরখাস্ত করেন, আপনি মুসলমানদের জন্য একজন খলীফা নির্বাচন করে যান। তখন হযরত ফারুকে আযম অনেক চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা ভাল হবে, যার দ্বারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুকরণ হয় এবং তাঁর খলীফা হযরত আবু বকর রা. এর তরীকারও অনুকরণ হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে কাউকে নির্দিষ্টভাবে খলীফা নির্বাচন করেননি বরং তাঁর ওফাতের পর ছাহাবায়ে কিরাম পরামর্শ করে ইজমাঈ রায়ের মাধ্যমে হযরত আবু বকর রা. কে খলীফা নির্বাচন করেন। যার সংক্ষিপ্ত জরুরী বিবরণ তাকলীদে শাখছীর আলোচনায় লিখা হয়েছে। এটা দ্বারা সাব্যস্ত হল, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ছিল তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন না করা বরং উক্ত ব্যাপারটা মুসলমানদের রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া। কিন্তু তাঁর প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রা. ইন্তেকালের পূর্বেই বড় বড়

ছাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে ওমর রা. কে খলীফা নির্বাচন করেছেন। যার বিবরণ উপরে লিখা হয়েছে। তাই তিনি এমন ছয়জন বিজ্ঞ সঠিক রায়ের অধিকারী ব্যক্তি দ্বারা খেলাফত কমিটি গঠন করেন যাঁদের উপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যাঁদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা হলেন, ১. হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. ২.হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা. ৩.হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. ৪.হযরত জোবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ৫.হযরত তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ রা. ৬.হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা.।

পরের দিন সকালে উল্লিখিত ছয় ব্যক্তিকে হযরত ওমর রা. নিজের কাছে ডেকে আনলেন। অতঃপর বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল পর্যন্ত আপনাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমার চিন্তাধারা অনুযায়ী আপনারা ছাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনন্য গুণের অধিকারী এবং সর্ব ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তাই আমি আপনাদেরকে নিয়ে খেলাফত কমিটি গঠন করলাম। আপনারা বৈঠক করে পরামর্শের মাধ্যমে ছয়জন থেকে একজনকে খলীফা নির্বাচন করবেন। খলীফা নির্বাচনের পূর্বে যদি আমার ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে তিন দিনের মধ্যে খলীফা নির্বাচনের কাজ সমাধা করে নিবেন। খলীফা নির্বাচনের কাজ তিনদিন যেন অতিক্রম না করে। চতুর্থদিন উম্মত যেন খলীফা ছাড়া না থাকেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত হযরত সোহাইব রা. মসজিদে নববীর ইমামতের কাজ আঞ্জাম দিবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে খেলাফতের পরামর্শ কমিটি বৈঠকে শরীক করে তার পরামর্শ নিতে পারবেন। কিন্তু তাকে খলীফা নির্বাচন করা যাবে না। খেলাফত কমিটির সম্মানিত সদস্য তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ঐ সময় মদীনাতে উপস্থিত ছিলেন না। এই জন্য উমর রা. বললেন "আমার ইন্তেকালের পর তিন দিনের মধ্যে যদি তালহা উপস্থিত হয়ে যায় তাহলে তাকে খেলাফতের পরামর্শ বৈঠকে শরীক করে নিবেন। যদি এই তিন দিনের মধ্যে উপস্থিত না হয় তাহলে তাকে ছাড়াই খলীফা নির্বাচন করে নিবেন। হযরত উমর রা. ঐক্যবদ্ধভাবে মিলে মিশে খলীফা নির্বাচনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য উপদেশ দেন এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। অপর দিকে ফারুকে আযম রা. মেকদাদ রা. কে হুকুম দিয়েছেন তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর দাফনের কাজ সম্পন্ন করে যেন তিনি খেলাফত কমিটির সকল সদস্যকে একটি নির্দিষ্ট ঘরে একত্রিত করে খলীফা নির্বাচনের কাজ আরম্ভ করেন। আরও বলেন, তাঁরা যেন তিন দিনের ভিতর

খলীফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করে নেন। তারা যদি ঐকমত্যে কাউকে খলীফা নির্বাচন করতে না পারেন তাহলে যার ব্যাপারে অধিকাংশের রায় হবে তিনিই পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হবেন। যদি উভয় দিকে রায় সমান হয়ে যায় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে হাকাম অর্থাৎ সালেস হিসেবে মনোনীত করবেন। তিনি যে দিকে ফয়সালা দিবেন তিনিই খলীফা নির্বাচিত হবেন। কিন্তু তিনি নিজেই খলীফা হতে পারবেন না। আর যদি উক্ত কমিটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে হাকাম বা ফয়সাল বানানোটা ভাল মনে না করেন তাহলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফের রায় যে দিকে হবে তিনিই খলীফা নির্বাচিত হবেন। হযরত উমর রা. এর ইন্তেকাল ও কাফন-দাফনের পর হযরত মেকদাদ রা. তাঁর হুকুম অনুযায়ী মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. এর ঘরে খেলাফত কমিটির সকল সদস্যকে একত্রিত করেন এবং খলীফা নির্বাচনের কাজ আরম্ভ করার জন্য বলেন। কিন্তু তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ঐ সময় পর্যন্ত উপস্থিত না হওয়ায় ফারুকে আযমের ইঙ্গিত অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে খেলাফত কমিটির শুরার বৈঠকে শরীক করে নেন।

বৈঠকে অনেক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. বললেন, আমি খেলাফতের দাবি ছেড়ে দিলাম এবং উম্মতের কল্যাণার্থে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, স্বজনপ্রীতি ছেড়ে ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি। এখন যদি আপনারা আমার রায় সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন তাহলে আমি যাকে খলীফা নির্বাচন করব আপনারা তা মেনে নিবেন। আপনারা এখন নিজেদের আস্থা ও মতামত প্রকাশ করুন। অতঃপর মজলিসের সকল সদস্য ঐকমত্যে তাঁর কথাকে সমর্থন করলেন এবং সমস্বরে বলে উঠলেন, আপনি যাকে খলীফা নির্বাচন করবেন আমরা তা মেনে নিব এবং এই ব্যাপারে যত প্রকারের সহগোগিতার প্রয়োজন আমরা তা করব। এই কথার পর ঐ দিন মজলিস সমাপ্ত হয়ে যায়। ফারুকে আযমের ইন্তেকালের কারণে মুসলিম অধ্যুষিত সকল প্রদেশের গভর্নর, সেনা প্রধান এবং মুজতাহিদ ও শীর্ষস্থানীয় ছাহাবায়ে কিরাম তখন মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকের পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. তাদের প্রত্যেকের সাথে একাকীভাবে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মত বিনিময় করেন এবং প্রত্যেকের মত যাচাই করেন। তাঁরা সকলে হযরত উসমান রা. এর ব্যাপারে মত দেন। তারপর তিনি নির্জনে হযরত আলী রা. এর নিকট যান এবং বললেন- ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অন্যান্য গুণাবলীর

আলোকে আপনি খলীফা হওয়ার যোগ্য। কিন্তু যদি কোন কারণের ভিত্তিতে আপনাকে খলীফা নির্বাচন করা না হয় তাহলে খেলাফত কমিটির মধ্য থেকে কে আপনার মতে খলীফা হওয়ার যোগ্য। তখন তিনি বললেন, উসমান রা. খেলাফতের যোগ্য। তারপর নির্জনে তিনি হযরত উসমান রা. এর নিকট যান এবং বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দুই কন্যাকে পরপর আপনার কাছে বিয়ে দিয়েছেন, যা অন্য কারো ভাগ্যে জুটে নি। তদুপরি বর্তমানে খলীফা হওয়ার যে সমস্ত বড় বড় গুণাবলী দরকার তা আপনার মধ্যে বিদ্যমান। তাই আপনি খেলাফতের ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু তারপরও যদি কোন কারণে আপনাকে খলীফা নির্বাচন করা না হয় তাহলে আপনার মতে খেলাফত কমিটির সদস্যগণ থেকে কে খেলাফতের যোগ্য? তিনি বললেন, হযরত আলী রা.। তারপর হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ রা. ব্যাপক হারে সাধারণ মুসলমানদের মতামত গ্রহণ করা আরম্ভ করে দেন। যেখানে মানুষকে সমবেত দেখতেন সেখানে সকলের মতামত চাইতেন। একাকী কাউকে পেলে তার মত গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয় বরং পর্দানশীন অনেক মহিলা থেকেও তিনি চুপে চুপে এই ব্যাপারে মতামত গ্রহণ করেছেন। গ্রাম অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের থেকেও এই ব্যাপারে মতামত গ্রহণ করেছেন।

মোদ্দাকথা, তিনি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত অবিরামভাবে মুসলমানদের মতামত গ্রহণের কাজে লিপ্ত থাকেন। যাদের থেকেই মতামত চেয়েছেন সকলে হযরত উসমান রা. এর ব্যাপারে মত দিয়েছেন। অবশেষে ঐ রাত্র এসে গেল যে রাত্রের পর সকালে খলীফার ঘোষণা দেয়া জরুরী। ঐ রাত্রে তিনি খেলাফত কমিটির সকল সদস্যের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। পরদিন সকাল বেলা ফজরের নামাযে নেতৃস্থানীয় মুজতাহিদ ছাহাবায়ে কিরাম ও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও সেনা প্রধানগণ এক কথায় মদীনার সকল মুসলমান মসজিদে নববীতে একত্রিত হন। সকলে একে অপরের সাথে লেগে বসেন নতুন খলীফার ঘোষণা শুনার জন্য। ঐ সময় আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. মিম্বারে তাশরীফ নিয়ে যান এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। তারপর মুসল্লিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি খেলাফতের ব্যাপারে যত প্রকারের চিন্তা-ফিকিরের দরকার আছে তা করেছি এবং সম্ভাব্য প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমানদের থেকে এই ব্যাপারে সমর্থন অর্জন করেছি। এখন আমি পূর্ণ আশাবাদী যাকে খলীফা বলে আমি ঘোষণা করব, আপনারা সবাই

আনন্দচিত্তে তা গ্রহণ করে নিবেন। অতঃপর উসমান রা. কে ডেকে সামনে নিলেন এবং বললেন, আপনি ওয়াদা করুন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত এবং পূর্ববর্তী দু'খলীফার আদর্শ অনুযায়ী খেলাফতের কাজ করে যাবেন। তখন হযরত উসমান রা. বললেন, ইনশাআল্লাহ যতটুকু সম্ভব আমি এই ভাবে খেলাফতের কাজ করার জন্য চেষ্টা করে যাব। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. হযরত উসমান রা. এর হাতে খেলাফতের বয়াত নিলেন এবং যে হাতের দ্বারা বয়াত নিলেন তা উপরের দিকে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন খেলাফতের ব্যাপারে আমার উপর যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে আমি এখন তা হযরত উসমানের উপর অর্পণ করলাম। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া খ.৭, পৃ.১৪৫-৪৬ ও সীরাতে যুননুরাইন)।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. এর বয়াতের পরে হযরত আলী রা. অত্যন্ত আগ্রহচিত্তে উসমান রা. এর হাতে খেলাফতের বয়াত গ্রহণ করেন। তারপরই সমস্ত মুসলমান দলে দলে একের পর এক তাঁর হাতেই বয়াত গ্রহণ করা আরম্ভ করেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ খ. ৩, পৃ.৬২; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া খ.৭, পৃ.১৪৭)

মোদ্দকথা, উসমান রা. ৬৮ বছর বয়সে ২৯ ই জিলহজ্ব ২৩ হিজরী খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. খেলাফত কমিটির অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার পর সমস্ত মুসলমান কোন প্রকার ঝগড়া ও দ্বিমত ছাড়া হযরত উসমান রা. এর হাতে খেলাফতের বয়াত গ্রহণ করেন। (খোলাফায়ে রাশেদীন লখনবী পৃ.১১১; মুহাজারাতে খিজরী বেক খ.২, পৃ. ২৩; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া খ.৭, পৃ.১৪৭)

হযরত আলী রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমা

হযরত আলী রা. এর খেলাফতও ছাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনের ঐকমত্যে কায়েম হয়। ৩৫ হিজরীর ১৮ জিলহজ্ব শুক্রবার হযরত উসমান রা. মিশর, বসরা ও কুফা থেকে আগত বিদ্রোহী জালেমদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.এর রেওয়ায়েত মতে মদীনা মুনাওয়ারাতে তাঁর শাহাদাতের পর 'মসনদে খেলাফত' ৫ দিন খালি ছিল। অর্থাৎ কাউকে ঐ পর্যন্ত খলীফা নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার দ্বিতীয় রেওয়ায়েত মতে ৩৫ হিজরীর ১৯ জিলহজ্ব মোহাজের ও আনসার তথা মদীনাওয়ালাদের প্রবল আগ্রহের ভিত্তিতে হযরত আলী রা.খেলাফতের বয়াত

গ্রহণ করেন। যা হোক তাঁর খেলাফতের ব্যাপারে তাফসীল হল, হযরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পর মুহাজির ও আনসার ছাহাবীগণ এবং তাবেঈগণ তথা সকল মদীনাবাসী তাঁকে খলীফা বানানোর ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে মোটেই রাজী ছিলেন না। বরং ঐ প্রস্তাবের পর মদীনার শহর এলাকা ছেড়ে তিনি কবীলায়ে বনী আমরের বাগানের পাশে এক ঘরে অবস্থান করেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। অতঃপর মদীনার মুসলমানরা যাদের মধ্যে হযরত যোবাইর ও তালহা রা. ছিলেন তাঁরা তাঁকে খোঁজ করতে করতে সেখানে পৌঁছেন যেখানে তিনি ছিলেন। ঐখানে গিয়ে তারা বললেন ইসলামী হুকুমতের অস্তিত্ব খলীফা ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। অতএব, আপনি উম্মতের দিকে চেয়ে দয়া করে খেলাফতের যিম্মাদারী গ্রহণ করুন। মুসলমানদের নিতান্ত আগ্রহপূর্ণ অনুরোধের কারণে হযরত আলী রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হন। অতঃপর আলী রা. মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে সমস্ত মুসলমান ৩৫ হিজরীর ১৯ জিলহজ্ব শনিবার তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭ম খ. ২৩৫ পৃ.)

আল্লামা ইবনে খালদুন এর তাহক্বীক অনুযায়ীও সাব্যস্ত হয় যে, হযরাত ছাহাবায়ে কিরাম (মুহাজির ও আনসার এর) বারংবার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির কারণে আলী রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সবার আগে হযরত তালহা ও হযরত যোবাইর রা. বয়াত গ্রহণ করেন। (তারীখে ইবনে খালদুন খ.২, পৃ.৬০২) তবে গ্রহণযোগ্য ও ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে উসমান রা. কে শহীদ করার জন্য মিশর, বসরা ও কুফা থেকে আগত বিদ্রোহীরা নিরুপায় হয়ে হযরত আলী রা. এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং তাঁর হাতে খেলাফতের বয়াত নেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করে। হযরত আলী রা.সময়ের চাহিদা মোতাবেক মদীনা শরীফ থেকে ফ্যাৎনার আগুন নির্বাপিত করার জন্য তাদেরকে বয়াত করে নেন। বিদ্রোহীরা বুঝে নিয়েছে নব নির্বাচিত মদীনার কেন্দ্রীয় খলীফার হাতে বাই'আত ছাড়া দেশে ফিরলে তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। ঐ সব দেশের মুসলমানরা তাদের হত্যা করে ফেলবে। এই ধারণার ভিত্তিতে তারা আলী রা. এর নিকট বয়াত গ্রহণ করতে তৎপর ও বাধ্য হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খ.৭,২২৫ পৃ.) বিদ্রোহীরা বয়াত গ্রহণ করার কারণে বড় বড় কিছু আনসার ও মুহাজির আলী রা. এর হাতে বয়াত গ্রহণ না করে মুলকে শাম (সিরিয়া) এর দিকে চলে গেছেন।

মোদ্দাকথা, হযরত উসমান রা.এর শাহাদাতের পর সমস্ত ছাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যে হযরত আলী রা. ই একমাত্র খেলাফতের যোগ্য ছিলেন। যদিও সাময়িক ফ্যাৎনা-ফাসাদের কারণে কিছু ছাহাবায়ে কিরাম তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। শিয়া ও রাফেযীরা উক্ত ইজমার বিরোধিতা করেছে এবং আবু বকর রা., উমর রা. ও উসমান রা. এর খেলাফত অস্বীকার করেছে। যেহেতু তারা প্রকাশ্যে কুরআন-হাদীছ ও ইজমায়ে উম্মত বিরোধীদল, তাই তাদের বিরোধিতা ও অস্বীকারের কোন মূল্য নেই। তারা ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করে তথা ঈমানদারদের পথ ছেড়ে সুরা নিসার ১১৫ নং আয়াতের ঘোষণা মতে আল্লাহ পাকের শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে।

ইজমার একটি উছূলী পদ্ধতি

ছাহাবায়ে কিরামের ইজমার একটি উসুলী পদ্ধতি সুনানে দারেমীর ৫৮ পৃ.তে আছে, ছিদ্দীকে আকবর রা. এর নিকট ফয়সালার জন্য কোন ঘটনা বা মাসআলা উপস্থিত হলে তিনি কুরআনে পাকের দ্বারা ফয়সালা দিতেন। কুরআনে তার ফয়সালা না পেলে হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা ফয়সালা দিতেন। আর যদি ঐ মর্মে তাঁর হাদীছ জানা না থাকত তাহলে অন্যান্য ছাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুঁজে বের করে ঐ মতে ফয়সালা দিতেন এবং এভাবে শুকরিয়া আদায় করতেন যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি রেখেছেন যিনি (বা যাারা) হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করেছেন। আর যদি প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীছ বা তরীকা পাওয়া না যেত তাহলে মুজতাহিদ ও নেতৃস্থানীয় ছাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে তাদের সাথে ঐ ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন সে অনুযায়ী সমাধান দিতেন।

হযরত আবু বকর রা. এর আমলে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের উপর ইজমা

হযরত আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর কিছু মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়। আর কিছু লোক যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করে। হযরত আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দিলেন। সমস্ত ছাহাবায়ে কিরাম

তার ঘোষণানুযায়ী মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদে শরীক হন। এটাও ইজমা শরী'আতের দলীল হওয়ার শক্তিশালী প্রমাণ। মূল ঘটনার আলোচনা বোখারী শরীফ: কিতাবুয যাকাত ১৮৮ পৃ., মুসলিম শরীফ: কিতাবুল ঈমান, ফতহুল মুলহিম ১৯০ পৃ.তে রয়েছে।

হযরত ফারূকে আ'যমের আমলে ইজমা

১ম ইজমা ফরয গোসল সম্পর্কে : একদা হযরত উমর রা. এর বৈঠকে ছাহাবায়ে কিরাম ফরয গোসল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাদের কেউ বললেন, স্বামী-স্ত্রীর সহবাস হলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে মনী (বীর্য) বের হোক বা না হোক। আর কেউ বললেল, বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। অতঃপর ওমর রা. বললেনঃ আপনারা বদরী তথা উত্তম ছাহাবায়ে কিরাম। আপনারা উক্ত মাসআলার ব্যাপারে আমার সামনে ইখতিলাফ করছেন তাহলে আপনাদের পরবর্তী ব্যক্তিদের কি অবস্থা হবে? অতঃপর আলী রা. এর প্রস্তাবে হযরত আয়েশা রা. এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়েশা রা. বললেন, মিলনকালে স্বামীর খতনার অংশটুকু স্ত্রীর খতনার অংশ অতিক্রম করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে (বীর্যপাত হোক বা না হোক)। হযরত আয়েশা রা. এর উত্তর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল এটাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখেরী ফতওয়া। অতএব উক্ত বৈঠকে সবার ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হওয়ার রায় দ্বারা গোসল ফরয না হওয়ার রায় মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। তাই উমর রা. বললেন, আজ থেকে যে ব্যক্তি মনি (বীর্যপাত) ছাড়া গোসল ফরয হবে না বলবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এ মর্মে কোন আপত্তি ছাড়া সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম উক্ত ফয়সালা মেনে নিলেন। (ত্বহাবী ১ম খ. ৩৬ পৃ. ও নাসরুল বারী শরহে বুখারী ২য় খ. ২৫২ পৃ.)

وفى الترمذى باب ما جاء أن الماء من الماء عن أبى بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصةفى أول الاسلام ثم نهى عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما كان الماء من الماء فى أول الإسلام ثم نسخ بعد ذالك هكذا روى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فى صحيح مسلم باب بيان أن الجماع كان فى أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المنى وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع ص ١٥٥ جلد ١

মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফ থেকে নকলকৃত রেওয়ায়েতের সারমর্ম হল, ইসলামের প্রথম ভাগে স্ত্রী সহবাসের দ্বারা বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয ছিল না। কিন্তু পরে এ হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। অর্থাৎ বীর্যপাত না হলেও গোসল করার হুকুম জারী করা হয়। কিন্তু ছাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই মাসআলা নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত দ্বিমত ছিল। অনেকে পূর্বের হাদীছ জানতেন ঐ মতে আমল করতেন, পরেরটা অস্বীকার করতেন। আর অনেকে পরেরটা জানতেন, তাই ঐ মতে আমল করতেন আর পূর্বেরটা মানসূখ (রহিত) ধরে নিতেন। শেষ পর্যন্ত খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. এর মজলিসে উক্ত মাসআলার ব্যাপারে দ্বিমূখী মত পেশ করার পর তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে শেষ মাসআলা জেনে পূর্বের মাসআলা রহিত বলে চূড়ান্ত ফয়সালা দিলেন। সমস্ত মুহাজির ও আনসার উক্ত ফয়সালাকে ঐকমত্যে মেনে নিলেন। উক্ত ইজমার পর যদি কেউ ইজমা বিরোধী কাজ করে তাকে শাস্তি প্রদানের ঘোষণাও দিয়ে দিলেন। হতে পারে মানসূখ হওয়ার ব্যাপারে ইজমাঈ ফয়সালার রেওয়ায়েতগুলি ইমাম বুখারী রহ.তাঁর শর্তের কাঠামো অনুযায়ী পাননি। তাই তিনি উভয় পক্ষের হাদীছ গুলোকে সামনে রেখে তাঁর ইজতেহাদের আলোকে এ ভাবে ফয়সালা দেন: والغسل أحوط অর্থাৎ ছাহাবাদের যারা বলেছেন বীর্যপাত না হলেও গোসল করতে হবে, সতর্কতামূলক ঐ রায়টি প্রাধান্যের যোগ্য। তাই সতর্কতামূলক গোসল করতে হবে। সতর্কতার অর্থ হলো, উসূলে হাদীছ ও উসূলে ফিক্হের আলোকে কোন ব্যাপারে জায়েয এবং ফরযের সংঘর্ষ হলে সতর্কতামূলক ফরযের দিককে, অনুরূপ হারাম-হালালেম মধ্যে সংঘর্ষ হলে হারামের দিককে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ জায়েয কাজ না করলে গুনাহ হবে না। কিন্তু ফরয আদায় না করলে কবীরা গুনাহ হবে। গোসল বাস্তবে ফরয হওয়া সত্ত্বেও যদি গোসল না করা হয় তাহলে ঐ অবস্থায় নামায পড়া হারাম হবে। তাই হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্কতামূলক গোসলকে ফরয বলেছেন।

২য় ইজমা: এক সাথে তিন ত্বালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে

কোন স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে এক শব্দে তিন ত্বালাক বা এক মজলিসে তিন ত্বালাক প্রদান করে তাহলে তিন ত্বালাক পতিত হবে না এক ত্বালাক পতিত হবে? হযরত উমর রা. কুরআন-হাদীছের আলোকে ফতওয়া দিয়েছেন যে, উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর উপর তিন ত্বালাক পতিত হয়ে ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে

যাবে। ছাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্যে তাঁর উল্লিখিত ফতওয়া মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ তথা উসমান রা. ও আলী রা. অনুরূপ ফতওয়া দিতেন এবং অন্যান্য মুজতাহিদ ছাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং চার মাযহাবের ইমামগণও উক্ত মতের উপরেই নিজেদের শেষ রায় কায়েম করে ফতওয়া দিয়েছেন। আর তাঁদের শত শত অনুসারী মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিছগণ অনুরূপ ফতওয়া দিয়েছেন এবং নিজ নিজ কিতাবে লিখেছেন। ঐ মত অনুযায়ী বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আমল করে আসছেন।

قال يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الهادى الحنبلى فى سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث- الفصل الثانى: فيمن قال بهذا القول ومن افتى به قال ابن عباس غير مرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعثمان وعلى وابن مسعود وهو قول أكثرأهل العلم وبه قال أحمد والشافعى وأبو حنيفة ومالك وأنس وابن أبى ليلى والأوزاعى الخ إلى أن قال- قال ابن رجب الحنبلى اعلم أنه لم يثبت من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة السلف المعتد بقولهم فى الفتاوى-فى الحلال والحرام شيئ صريح فى أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد فى احسن الفتاوى صـ٢٩٠ كتاب الطلاق . قال ابن رجب فى أخر كتاب اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين أحدهما ما لم يعلم للنبى صلى الله عليه وسلم فيه قضاء بالكلية وهو على نوعين (١) ما جمع فيه عمر الصحابة وأشارهم فيه فاجمعوا معه عليه فهذا لا يشك أنه الحق كهذه المسئلة وفيه صـ٣٠٤ نقل إجماع الصحابةإمام الطحاوى أيضا –

শায়খ ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল হাদী হাম্বলী রহ.এবং শায়খ ইবনে রজব হাম্বলী রহ.এর নকলকৃত ইবারতের এবং ইমাম ত্বহাবীর বয়ানের সারমর্ম হল, কোন স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক শব্দে তিন ত্বালাক প্রদান করে তাহলে আখেরী তিন খলীফা এবং অন্যান্য সব ছাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যে, অনুরূপ তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের মতে এবং চার মাযহাবের ইমামগণের ঐকমত্যে তিন ত্বালাক পতিত হয়ে যাবে। তাঁদের উল্লেখিত ইবারত দ্বারা আরও পরিস্কার হয়ে গেল যে, ঐ ব্যাপারে হযরত উমর রা. এর আহবানে ছাহাবায়ে কিরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে পরামর্শের মাধ্যমে ঐ ব্যাপারে ইজমা কায়েম হয়।

১৩৯৩ হিজরী মাহে রবিউস সানীতে সৌদি সরকারের হুকুমে উক্ত মাসআলার ব্যাপারে নিম্নে উল্লেখিত প্রসিদ্ধ আহলে ইলম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শায়খগণের সমন্বয়ে একটি ফতওয়ার বৈঠক সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সদস্য ছিলেন।

১. শায়খ আব্দুল আজীজ বিন বায
২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হামীদ
৩. শায়খ মুহাম্মাদুনিল আমীন
৪. শায়খ সোলায়মান বিন আবীদ
৫. শায়খ আব্দুল্লাহ খাইয়াত
৬. শায়খ মুহাম্মাদুনিল হারকান
৭. শায়খ ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ
৮. শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফিফী
৯. শায়খ আব্দুল আজীজ বিন সালেহ
১০. শায়খ সালেহ
১১. শায়খ মুহাম্মদ বিন জাবির
১২. শায়খ আব্দুল মজীদ হাসান
১৩. শায়খ রাশেদ বিন হোসাইন
১৪. শায়খ সালেহ বিন লাহীদান
১৫. শায়খ মিহসর আক্বীল
১৬. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন গাদইয়ান
১৭. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন সুনী

উক্ত ফেকহী ইজতিমার আখেরী রায়ের সংক্ষিপ্ত ইবারতঃ

وبعد دراسة المسئلة وتداول الرأى واستعراض الأقوال التى قبلت منها ومناقشة ما على كل قول من إيراد توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وذالك لأمورأهمها ما يلى–

অর্থাৎ উক্ত মজলিসে এক শব্দে তিন ত্বালাক আরোপের মাসআলার ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যগণের মত প্রকাশ ও মত বিনিময়ের পর এবং ঐ ব্যাপারে পূর্বের ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং মুজতাহিদীনে কিরামের গ্রহণযোগ্য রায়গুলো পেশ করার পর এবং প্রত্যেক রায়ের ব্যাপারে উত্থাপিত

প্রশ্নগুলোর দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে খণ্ডানোর পর অধিকাংশ সদস্যগণের রায়ের ভিত্তিতে মজলিস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একশব্দে তিন ত্বালাক প্রদান করলে স্ত্রীর উপর তিন ত্বালাক পতিত হয়ে যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ আরব-আজম তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদের আমল ঐ সহীহ মত অনুযায়ী চালু আছে। উক্ত রায়ের পর মজলিসের পক্ষ থেকে কুরআন ও সহীহ্ হাদীছ, ইজমা ও সহীহ্ কিয়াস ইত্যাদি দ্বারা অকাট্য দলীলসমূহ পেশ করা হয়েছে। এখানে শুধু ইজমার ব্যাপারটা বুঝানোর জন্য ঐ ব্যাপারে বিজ্ঞ ইলমওয়ালাদের কিছু মতামত নকল করা হয়েছে। এ ধরনের মাসআলা সমূহের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে পৃথক পুস্তিকা লিখা হবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের তথাকথিত আহলে হাদীছের মুখপাত্র ড.আসাদুল্লাহ গালিব তার তালাক ও তাহলীল'শীর্ষক বইয়ে খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও মুসলিম উম্মাহর উল্লিখিত ইজমার বিরোধিতা করে এবং কোরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হয়। গালিব সাহেব তিন তালাকে এক তালাকের প্রবক্তা হয়ে ইজমার বিরোধিতা করে ইজমাবিষয়ক কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের বিরোধিতা করেছেন, সাথে সাথে তার ভক্ত মুসলমানদেরকে অবৈধ ঘরসংসার করার এবং জারজ সন্তান জন্ম দেয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

৩য় ইজমা

২০ রাকাত তারাবীহ্ জামা'আতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফের তারাবীহ অধ্যায়ে সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩/৪ দিন তারাবীহ নামায জামাতে পড়িয়েছেন। তার পরের দিনও ছাহাবায়ে কিরাম হুজুরের পিছনে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফের হুজরা থেকে বের হন নি। পরের দিন সকালে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের উপস্থিতি এবং আমার সাথে নামায পড়ার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা আমি দেখেছি। কিন্তু আমি নিয়মিত জামাতের সাথে নামায পড়লে এই নামাযটা উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাবোধ করে বের হই নি।

বুখারী শরীফের তারাবীহ অধ্যায়ে রয়েছে, হযরত উমর রা. রমযানের কোন রাত্রে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং দেখতে পান মসজিদের বিভিন্নস্থানে ছোট ছোট তারাবীর জামাত হচ্ছে। তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন, সকল নামাযীকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দেয়া ভাল হবে। তখন তিনি উবাই ইবনে কা'ব রা. কে ইমাম বানিয়ে দেন। সমস্ত মুসল্লিদেরকে তাঁর পিছনে এক সাথে নামায পড়ার আদেশ জারি করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) মুয়াত্তা মালেকের অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তামহীদ' এ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নতুন কিছু করেন নি। তিনি তাই করেছেন যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন। অর্থাৎ জামাতের সাথে নামায আদায় করা। কিন্তু শুধু এই আশঙ্কায় যে, নিয়মিত জামাতের কারণে তারাবীর নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে। তাই জামাতের ব্যবস্থা করেন নি। পরবর্তীতে উমর রা. দেখলেন, নবীজির ইন্তেকালের পর এখন আর এই ভয় নেই। কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরী'আত নির্ধারণের বিষয়টি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হিজরীতে জামাতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা যেন এ মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আবু বকর রা. এর মনে এই চিন্তা আসে নি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।

(আত-তাহমীদ ৮খ. ১০৮-১০৯ পৃ.)

এতদিন পর্যন্ত তারাবীহ একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমল ছিল। জামাত হলেও প্রত্যেকে পুরা তারাবীহ জমাতে পড়বেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাই তারাবীর রাকাতে সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ আলোচনার পরিবেশ ছিল না। কিন্তু যখন মসজিদে নববীতে গুরুত্বের সাথে পুরো তারাবীহ একই ইমামের পিছনে পড়া হতে থাকে এবং তা হতে পারে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে, তখন তারাবীর রাকাতের সংখ্যা আর কোন গোপন বিষয় থাকে নি। এখন সবাই প্রকাশ্যেই দেখতে পাচ্ছিলেন তারাবীর নামায কত রাকাত এবং ছাহাবায়ে কিরাম এতদিন পর্যন্ত কত রাকআত পড়তেন। দেখার বিষয় হল, সে সময় মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায কত রাকাত পড়া হত।

সহীহ্ হাদীছের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে সহীহ্ এবং মুতাওয়াতির অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়েতের দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, আশারায়ে মুবাশশারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ছাহাবী (আবু বকর রা. ছাড়া, কেননা

তিনি তখন জীবিত ছিলেন না) এবং মুহাজির ও আনসারী ও অন্যান্য ছাহাবায়ে কিরামগণ ১৪ হিজরী থেকে উমর রা. এর হুকুমে ঐক্যবদ্ধভাবে তারাবীর নামাজ বিশ রাকাত ও বিতর তিন রাকাত জামাতের সাথে আদায় করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত প্রমাণ আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী খ.১, পৃ.৪৯৬। খ.২ পৃ.২৬৭-২৬৮; মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার লিল বায়হাকী খ.২,পৃ. ৩০৫ মুয়াত্তা মালেক পৃ.৪০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা খ.২, পৃ.২৮৫; মাজমূআয়ে ফতওয়ায়ে শায়খ ইবনে তাইমিয়া খ.২৩, পৃ.১১২-১১৩

উল্লিখিত কিতাব সমূহে সহীহ্ সনদ দ্বারা হাদীছ নকল করা হয়েছে যে, হযরত উমর রা. এর যুগ থেকে তাঁর এহতেমাম ও আদেশের মাধ্যমে বিশ রাকাত তারাবীহ, তিন রাকাত বিতরের জামাত সমস্ত ছাহাবায়ে কিরাম ঐক্যবদ্ধভাবে আদায় করেছেন। ইজমা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে তথাকথিত আহলে হাদীছরা তারাবীহর ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের উক্ত ইজমার বিরোধিতা করে তারাবীহর নামায আট রাক'আত বলে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টি করছে এবং অসংখ্য ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত করছে। বিশ রাকাত তারাবীর ব্যাপারে বিস্তারিত দলীলের আলোকে ইনশাআল্লাহ তা'আলা পরে পুস্তিকা লেখা হবে।

উসমান রা. এর যুগে ইজমা

১ম ইজমাঃ শুধু কুরাইশী ভাষাতে কুরআন মজীদের সংকলন

বুখারী শরীফ ২য় খ.৭৪৬ পৃ.তে নকল করা হয়েছে, হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. আরমেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয় করার উদ্দেশ্যে সাথীদের নিয়ে জিহাদের জন্য বের হলেন। ঐখানে গিয়ে দেখলেন, ইরাক ও শাম (সিরিয়া) এর মুসলমানদের মধ্যে কুরআন মজীদের কেরাত নিয়ে তুমুল ঝগড়া চলছে। ইরাকের মুসলমানরা কোন কোন আয়াতের শব্দকে এক রকম পড়ে এবং শামের মুসলমানরা অন্য রকম পড়ে। তাদের প্রত্যেক দল নিজেদের কেরাতকে সঠিক বলে মনে করে। এই ঘটনা দেখে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. এর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তিনি সফর থেকে আসার পর হযরত উসমান রা. এর নিকট এই ঘটনা পেশ করলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এই ব্যাপারে উম্মতের অবস্থা জেনে উক্ত ঝগড়া নিরসনের জন্য তদবীর গ্রহণ করুন। নতুবা ইয়াহুদী নাসারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে এখতেলাফ ও ঝগড়া করে তাদের ধর্মকে যেভাবে সর্বনাশ করেছে এই

উম্মতের ব্যাপারেও ঐ আশঙ্কাবোধ করছি। তখন হযরত উসমান রা. তাৎক্ষণিকভাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. এর নিকট কুরআনের যে ছহীফা (কপি) ছিল তা তলব করেন। বললেন, আপনার ছহীফাটা আমাদেরকে দিন, আমরা নকল করার পর আপনার ছহীফা আপনাকে দিয়ে দিব।

উল্লেখ্য যে, হযরত আবু বকর রা. এর খেলাফতের আমলে যখন অনেক হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন, তখন ছাহাবায়ে কিরাম হযরত আবু বকর রা. কে পরামর্শ দেন যে, হাফেজে কুরআন এইভাবে শহীদ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে, ভাল হত যদি আপনি সমস্ত কুরআনে কারীম এক জায়গায় জমা করে দিতেন। তখন হযরত আবু বকর রা. এর আদেশে যার কাছে কুরআনের যে অংশ ছিল তারা তা হযরত আবু বকর রা. এর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি তরতীব মতে সমস্ত কুরআন এক জায়গায় জমা করে সহীফা বানিয়ে রাখেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমর রা. এর নিকট এই কপি ছিল। হযরত উমর রা. ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. এর কাছে এই কপি আমানত রাখেন।

হযরত উসমান রা. উক্ত সহীফা থেকে কুরআন নকল করার জন্য চারজন বিশিষ্ট ছাহাবীকে দায়িত্ব অর্পন করেন। তাঁরা হলেন, যায়েদ বিন সাবেত, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম। সাথে সাথে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় বিভিন্ন ভাষার সহীফা থেকে শুধু কুরাইশী ভাষায় কুরআনে করীম নকল করার জন্য। যেহেতু আরব দেশের সব ভাষা থেকে কুরাইশী ভাষা অধিক শুদ্ধ তাই প্রথমে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরাইশী ভাষাতেই কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়। তবে আরব দেশের অনেক অঞ্চলের লোক এমন আছে তাদের কুরাইশী ভাষা বুঝতে কষ্ট হয়। তাই রাহমাতুল্লিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে দরখাস্ত করলেন, হে আল্লাহ! তাদের ভাষাতেও কুরআন মজীদ নাযিল করুন যাদের কুরাইশী ভাষা বুঝতে কষ্ট হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরখাস্ত অনুযায়ী সাত ভাষাতে কুরআন মজীদ নাযিল হয়, যা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত

أنزل القران على سبعة أحرف

যেহেতু সাত ভাষায় কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে তাই ছাহাবায়ে কিরাম ও মুসলমানদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতনৈক্য সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ভাষাওয়ালা

নিজের ভাষায় কুরআনকে শুদ্ধ মনে করতেন এবং অপর ভাষা ওয়ালাদের কুরআন মজীদকে ভুল মনে করতেন। তাই খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান রা. মুজতাহিদ ছাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কুরাইশী ভাষায় কুরআন পড়া ও লিখা হবে এবং এই ভাষাতে সব জায়গায় প্রচার করা হবে যাতে ফ্যাৎনা ও ঝগড়ার মূলোৎপাটন হয়ে যায়। এই মর্মে উল্লেখিত চারজন ছাহাবীকে শুধু কুরাইশী ভাষাতে কুরআন মজীদ নকল করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা কুরআন মজীদ কুরাইশী ভাষায় নকল করে উসমান রা. এর সামনে পেশ করেন। হযরত উসমান রা. তার বিভিন্ন কপি তৈরী করে বসরা, কুফা, মক্কা, শাম ও অন্যান্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। সমস্ত ছাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন হযরাত তথা সমস্ত মুসলিম জাতি ঐ কপিগুলো সাদরে গ্রহণ করে নেন। এতে সবাই ঐকমত্য প্রকাশ করেন। কোন মুসলমান দ্বিমত পোষণ করেননি। এটা হলো ইজমা। সে অনুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চলে কুরআন মজীদের তা'লীম ও তেলাওয়াত আরম্ভ হয়। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে শুধু কুরাইশী ভাষাতেই কোরআন মজীদের তা'লীম ও তেলাওয়াত চালু আছে।

২য় ইজমা

জুমার নামাযের জন্য প্রথম আযান চালু করা

বুখারী শরীফের ১ম খ. জুমার আযানের অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহ.ছাহাবীয়ে রাসূল হযরত সামের ইবনে ইয়াযীদের হাদীছ নকল করেন। হযরত সামের ইবনে ইয়াযীদ রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে, আবু বকর ও উমর রা. এর যুগে ইমাম যখন মিম্বারে বসতেন তখন জুমার জন্য আযান দেয়া হত। যখন হযরত উসমান রা. খলীফা হলেন তখন লোক অনেক বেড়ে যায়, (মদীনা মুনাওয়ারার আবাদী অনেক বেড়ে যায়) যার কারণে ভিতরের আযান দূরের লোকেরা শুনতো না। তাই হযরত উসমান রা. মদীনা বাজারের 'যাওরা' নামক জায়গায় খুৎবার আযানের পূর্বে আরেকটি আযান দেয়ার হুকুম করেন। তাঁর আদেশক্রমে এই প্রথম আযান আরম্ভ হয়। যদিও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. এর যুগে উক্ত আযান ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান রা. প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই প্রথম আযানের প্রচলন করেন। সমস্ত মুজতাহিদ ছাহাবায়ে কিরাম বরং সমস্ত ছাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন কেউ তার বিরোধিতা

করেন নি বরং সবাই সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করেন। এটা হলো ইজমা। এই ধরনের নব আবিস্কৃত কাজকে শরী'আতের পরিভাষায় বিদআতে হাসানা বলা হয়। যা দ্বীন কায়েম করার জন্য ও দ্বীন প্রচার-প্রসারের জন্য আবিস্কার করা হয়। এই ধরণের বিদআত শরী'আতে নিষিদ্ধ নয় বরং তা সুন্নতের মধ্যে শামিল। এই অর্থের ভিত্তিতে ইন্তেজামের সাথে এক ইমামের পিছনে ২০রাকাত তারাবীর নামাজ জামাতে পড়াকে হযরত উমর রা. نعم البدعة অর্থাৎ এটা ভাল নবাবিস্কৃত জিনিস বলেছেন। যা বুখারী শরীফের তারাবীহ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহ.নকল করেছেন। যেমন প্রাথমিক যুগে কুরআন ও হাদীছের তা'লীম ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় মাদ্রাসা পদ্ধতি ছিল না। যাতে নির্দিষ্ট ঘণ্টা নির্ধারিত রয়েছে দরসের জন্য এবং উসতাদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত রয়েছে, ছাত্র উস্তাদের হাজিরা খাতা রয়েছে। তদ্রূপ বর্তমান যুগের ন্যায় প্রাথমিক যুগে ওয়াজ-মাহফিল ও কুরআনের তাফসীরের এই ধরণের ব্যবস্থা ছিল না। এইগুলো নব আবিস্কৃত জিনিস হলেও দ্বীনের তা'লীম ও প্রচারের জন্য হয়েছে। তাই সর্বমহলের নিকট ভাল কাজ। যেমনিভাবে মুসল্লিদের অযুর সুবিধার্থে পুকুর বা দীঘিতে ঘাট তৈরী করা হয়, এটা একটা সাওয়াবের কাজ। কারণ, যেহেতু এটা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অযু, নামায কায়েম করার সহায়ক। যদি কেউ এটাকে সরাসরি সুন্নত বলে তাহলে তা বিদআতে সায়্যিয়া হবে। আর যদি সুন্নতের সহায়ক বলে তাহলে তা বিদআতে হাসানা হবে। তা ছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছহীহ্ হাদীছের শেষ ভাগে বলেছেন, আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে অনেক মতভেদপূর্ণ মাসআলা ও ঘটনা দেখতে পাবে। ঐগুলোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আমার সুন্নত এবং আমার হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নতকে অপরিহার্যভাবে গ্রহণ করবে এবং মাড়ির দাঁতের দ্বারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে। হাদীছটি তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে দারমী, মুসতাদরাকে হাকেম, মেশকাত শরীফ ইত্যাদি হাদীছগ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত হাদীছ দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা মুসলমানদের জন্য শরী'আতের দলীল ও সনদ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। তাই হযরত উমর ও হযরত উসমান রা. এর যুগে যে সব মাসআলার ব্যাপারে ইজমা কায়েম হয়েছে সেগুলো শরী'আতের দলীল এবং মুসলমানদের জন্য অবশ্যই পালনীয়। তদ্রূপ

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দ্বারা এবং সমর্থন দ্বারা তাকলীদে শাখছী তথা একজনের তাকলীদ করা জায়েয বরং জরুরী সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপ খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কিরামের ইজমাঈ আমল ও তাবেঈন, তাবে তাবেঈন তথা খাইরুল কুরূনের মুজতাহিদ ও হাফেযে হাদীছ এবং হাদীছের ধারক-বাহক আলেমদের ইজমাঈ আমল দ্বারা তাকলীদে শাখছী ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। যার তাফসীলি বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে। উপরে কুরআন হাদীছ থেকে গ্রহণযোগ্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কিরাম ও মুজতাহিদদের ইজমা মুসলমানদের সনদ ও শরী'আতের দলীল। ঐগুলোর বিরোধিতা করে ছাহাবায়ে কিরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের দুশমন গোমরাহ পথভ্রষ্ট শিয়ারা এবং শিয়া মেজাজের লোক আহলে হাদীছ গাইরে মুকাল্লিদরা। তারা তাঁদের বিরোধিতা করে সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাকের ঘোষিত শাস্তির উপযোগী হয়ে গেছে। তাই মুসলমানদের তাদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কেয়াস শরী'আতের দলীল

পূর্বে আয়াতে কারীমা, ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলসমূহের আলোকে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহিদগণের কিয়াস শরী'আতের দলীল। শয়তানের কিয়াস আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বিরোধিতার জন্য। আর মুজতাহিদগণের কিয়াস ছিলো আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত বাস্তবায়ন করার জন্য। উভয় কিয়াসের মধ্যে আসমান-জমিনের তফাত রয়েছে। উভয়কে একশ্রেণীর ধারণা করা বোকামী, মুর্খতা, ভ্রষ্টতা ও ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই না।

বিভিন্ন উসূলে ফিকাহর কিতাবসমূহের ইবারতের সারমর্ম অনুযায়ী কেয়াসের শরয়ী সংজ্ঞা হলো; কোরআন-হাদীছের স্পষ্ট বাণী দ্বারা শরি'আতের যে সমস্ত হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে মুজতাহিদগণের খোদাপ্রদত্ত ইজতিহাদী শক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনে ঐ সমস্ত হুকুমের কারণ বের করা, অতঃপর যে সমস্ত বস্তুর ব্যাপারে শরী'আতের স্পষ্ট হুকুম সাব্যস্ত হয়নি সেগুলোতে যদি ঐ কারণ প্রতিয়মান হয় তার ভিত্তিতে কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া হুকুমটি উক্ত বস্তুর ব্যাপারে জারি করা । যেমন; খমর (خمر) অর্থাৎ মদ পান করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে, মুজতাহিদের ইজতিহাদের আলোকে তার কারণ সাব্যস্ত হয় 'নেশা'। নেশার কারণে মদকে হারাম করা হয়। বর্তমানে অনেক নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরী করা হচ্ছে যেগুলোর ব্যাপারে কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন হুকুম নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ঐসব বস্তুর কোনো অস্তিত্ব ছিলোনা তারপরও ফকীহগণ ঐসব বস্তু ভক্ষণ করা কিংবা পান করাকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তার একমাত্র কারণ 'নেশা' যা মদ হারাম হওয়ার কারণ। (উসূলুশ শাশী: পৃ.৩২৫; আল মাদখল: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: পৃ. ১৫১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ – الحشر: ٢

"হে জ্ঞানী লোকেরা তোমরা (হত্যকারীদের উপর অর্পিত হত্যা এবং দেশান্ত রিত করার শাস্তির ঘটনা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ কর " তথা যে কারণে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে উল্লিখিত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে ঐ সবকারণ থেকে তোমরা বেঁচে থাক। (সূরা হাশর:২)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর প্রতি তাদের শত্রুতা ও তাঁর নবুয়াতের দাবীকে তারা মিথ্যা বলার কারণে তাদের উপর গযব এসে গেছে। সুতরাং জেনে রাখতে হবে, ভবিষ্যতে যারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতা রাখবে এবং তাঁর নবুয়াতের দাবীর ব্যাপারে তাঁকে মিথ্যুক বলবে তাদের উপর অনিবার্যভাবে আল্লাহ পাকের আযাব পতিত হবে। তাই জ্ঞানী লোকেরা যেন তাদের অবস্থার উপর কেয়াস করে তথা এর সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের অবস্থাকে আযাবের উল্লিখিত কারণসমূহ থেকে হিফাযত করেন। উম্মতের মুজতাহিদগণ উক্ত আয়াতে কারীমাকে কিয়াস যে শরী'আতের দলীল তার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ, উক্ত আয়াতে কারীমাতে আযাবে নিপতিত কাফেরদের অবস্থার উপর কেয়াস করে জ্ঞানীদেরকে নিজেদের ঈমান আকিদা হিফাযত করে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে বেঁচে থাকার হুকুম দিয়েছেন। ঈমান-আকিদা হিফাযত রাখার জন্য উক্ত আয়াতে কারীমাতে যেভাবে আল্লাহপাক কেয়াস করার জন্য হুকুম জারী করেছেন তথা কেয়াস করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন, তদ্রূপ উক্ত আয়াতে কারীমার আলোকে হাজার হাজার গাইরে মানছুছ নবাবিষ্কৃত বস্তু ও নতুনসৃষ্ট ঘটনা, সমস্যাদির সমাধানের জন্য কুরআন-হাদীছের স্পষ্টবাণীসমূহের উপর কেয়াস করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। মোদ্দাকথা, ঈমান-আকিদা হেফাযত করার জন্য যেভাবে কেয়াস করা ওয়াজিব তদ্রূপ আমল সংরক্ষণ করার জন্যও কেয়াস করা ওয়াজিব।

কিয়াসের প্রমাণ

পূর্বে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তাকলীদে শাখছী শিরোনামে ১ম দলীলে মু'আয ইবনে জাবাল রা. এর হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে যাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাযুক্ত সমর্থন দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে. কেয়াস শরী'আতের দলীল। তাছাড়া কিতাবের প্রথমাংশে যেসব আয়াত-হাদীছ ও আছারে ছাহাবা দ্বারা মুজতাহিদগণের যিম্মায় ইজতিহাদ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে সেসব দ্বারা কিয়াস করাও যে ওয়াজিব একথাও প্রমাণিত হয়। কারণ অধিকাংশ ইজতিহাদ কিয়াসের মাধ্যমেই হয়ে থাকে ।

হিন্দুস্তানের গাইরে মুকাল্লিদদের বড় আলেম নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ছাহেব তার লিখিত আল জুন্নাহ কিতাবের ১২পৃষ্ঠায় স্বীকারপূর্বক বলেন:

وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاءوالمتكلمين إلي أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة يستدل به علي الأحكام إن لم يرد بها السمع وليس نص ولااجماع الخ

অর্থাৎ তিনি বলেছেন, অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন হযরাত ও ফোকাহায়ে ইযাম, আকায়েদের ইমামগণের মতে কিয়াস শরী'আতের দলীলসমূহ থেকে একটি দলীল। শরী'আতের গাইরে মানছুছ তথা যেসব আহকামের ব্যাপারে কোরআন-হাদীছে স্পষ্টবাণী বা ইজমা'এ-উম্মত সাব্যস্ত হয়নি সেসব বিষয়ে শর'য়ী কিয়াস দলীল হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

জনাব নবাব ছিদ্দীক খান ছাহেবকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এজন্য যে, তিনি গাইরে মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়ালজামা'আতের মত আকিদা পোষণ করেছেন এবং স্বীয় তাফসীরের কিতাব ও অন্যান্য কিতাবে তা প্রকাশ করেছেন। যা দ্বারা জাহেল, মুর্খ গাইরে মুকল্লিদদেরকে প্রতিরোধ করতে আমাদের জন্য কিছুটা সুবিধা হয়েছে। যেমন কিয়াসের ব্যাপারে তার উল্লিখিত লিখাটি হকপ্রকাশে আমাদের জন্য সহায়ক হয়েছে । তিনি যেভাবে 'আলজুন্নাহ' কিতাবে উক্ত মত প্রকাশ করেছেন তদ্রূপ তার ফারসী ভাষায় লিখিত কিতাব 'ইফাদাতুশ শুয়ুখ' নামক গ্রন্থেও তা লিখেছেন, তবে এতটুকু কথা বাড়তি লিখেছেন :

وظاہریہ انکارش کردہ

ফিরকায়ে যাহেরিয়া, যারা ইমাম দাউদ যাহেরীর মুকাল্লিদ তারা কেয়াসকে শরী'আতের দলীল বলে না এবং কিয়াসের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করে। নবাব ছিদ্দীক ছাহেব তার তাহকীক ও গবেষণা অনুযায়ী বলেছেন, কিয়াস শরী'আতের দলীল হওয়াটা অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন, ফকীহ ও 'আকায়েদের ইমামগণের রায় ও মত। তবে আমাদের গবেষণা মতে সকল মুজতাহিদ ছাহাবা, তাবে'য়ীন, তবে-তাবে'য়ীন ও জমহুরে ফোকাহায়ে কেরামের ঐকমত্যে কিয়াসে শর'য়ী শরী'আতের দলীলসমূহ থেকে একটি দলীল।

কিয়াস অস্বীকারকারীদের মাযহাবের বিলুপ্তি

দাউদে যাহেরী (মৃত:২৭০হি.) সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি কিয়াসকে অস্বীকার করেছেন এবং তাকে শর'য়ী দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ. ২, প.১৩৬; আদদীবাজ পৃ.১২)

আল্লামা ইমাম সাবকী রহ. (তাবকাতুত তারিয়াতুল কোবরা, খ.২, পৃ.৪৫) লিখেছেন, কিয়াস অস্বীকারকারীকে ইসলামী কোর্টের বিচারপতি বানানো যাবেনা, (তদ্রূপ তারা মুফতী হওয়ারও যোগ্য নয়) কারণ কোর্টে অনেক নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যা উপস্থাপিত হবে। তদ্রূপ মুফতী ছাহেবের নিকট ঐ ধরণের সমস্যাদি আসবে যেগুলোর ফয়সালা ও সমাধান কেয়াসের মাধ্যমে ইজতিহাদ করে দিতে হবে। আর এই কারণেই দাউদে যাহেরীর মাযহাব কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, কিয়াস না করার কারণে তার অনুসারী আলেমরা শরী'আতের সকল বিষয়ে ফতোয়া ও ফয়সালা দানে অক্ষম, একারণে তাদের ধারাবাহিকতা বহাল থাকেনি। তাই প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ আল্লমা ইবনে খালদুন রহ. মুকাদ্দমায়ে ইবনে খালদুনের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ولم يبق إلا في الكتب المجلدة تاريخ ابن خلدون- طبعة ثانية ١ / ٤٤٣

অর্থাৎ আহলে যাহের তথা কিয়াস অস্বীকারকারীদের অনুসারী ও প্রচারক আলেম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ছাহাবা, তাবে'ঈন, তবে-তাবে'ঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সবিশেষ স্বর্ণযুগের মুজতাহিদীনে কেরামের ঐক্যবদ্ধ রায় হলো, কিয়াস ইসলামের দলীলচতুষ্টয়ের একটি, যা কোরআন-হাদীছের অকাট্য দলীলসমূহের আলোকে সাব্যস্ত হয়েছে।

গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা অকাট্য দলীল থেকে ও ছাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনে কেরামের অনুকরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে দাউদে যাহেরীর তাকলীদ গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় তারা মুজতাহিদীনে কেরামের কিয়াসে শর'য়ীকে ইবলিসের ভ্রান্ত কিয়াসের সাথে তুলনা করার স্পর্ধা পর্যন্তও দেখিয়েছেন এবং হারাম বলেছেন। এইটা তাদের বদনছীবি ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই না।

এখন আমার আরয হলো, তারা যেন নবাব ছিদ্দীক খান ছাহেবের উল্লিখিত গবেষণা অনুযায়ী নিজেদের আকিদা শুদ্ধ করে নেন এবং কিয়াসকে শরী'আতের দলীল হিসেবে স্বীকার করে নেন। এতেই তাদের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

ইমাম বোখারী রহ.এবং ইজতিহাদ ও কিয়াস

ইমাম বোখারী রহ. তাঁর কিতাব আরম্ভ করেছেন শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা, আলহামদুলিল্লাহ তথা খুতবায়ে মাছুরা লিখেন নি; অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজসমূহ যেভাবে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার কথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত তেমনিভাবে আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করার কথাও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এখন প্রশ্ন হলো, ইমাম বোখারী রহ. আলহামদুর হাদীছ মতে কেন আমল করেন নি? ।

এই ব্যাপারে হাদীছের ব্যাখ্যাকারী মুহাদ্দিছগণ তাঁর পক্ষ থেকে একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন।

প্রথম উত্তর: ইমাম বোখারী রহ. যদিও ইমাম শাফে'ঈ রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন কিন্তু তিনি সাধারণ মুকাল্লিদ ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন মুজতাহিদ মুকাল্লিদ। অধিকাংশ অধ্যায়ের শিরোনাম প্রণয়নের মধ্যেই তাঁর তীক্ষ্ণ ইজতিহাদী শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর প্রণীত শিরোনামসমূহে তাঁর ইজতিহাদী সক্ষমতা ও সুনিপুণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই জন্যই তাঁর পরবর্তী মুহাদ্দেছীন ও ফোকাহায়ে কেরাম তাঁর ব্যাপারে এই ঐতিহাসিক উক্তি করেছেন,

فقه البخاري في تراجمه

অর্থাৎ ইমাম বোখারী রহ. এর ফিকাহ তথা তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা তাঁর লিখিত অধ্যায়সমূহের শিরোনামগুলোতে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এই মর্মে তিনি আপন তীক্ষ্ণ ইজতিহাদের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন। তাহলো গুরুত্বপূর্ণ ভালোকাজ শুরু করাবিষয়ক তিন প্রকারের হাদীছ পাওয়া যায় যথা:

১. বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা।
২. হামদ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করা।
৩. আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারা আরম্ভ করা।

ইমাম বোখারী রহ. সংক্ষেপে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করে হাদীছত্রয়ের উপর এক সঙ্গে আমল করেছেন। কারণ, বিসমিল্লাহর মধ্যে ''আর রহমান'' ও ''আর রহীম'' দুই গুনবাচক নাম আছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা সাব্যস্ত হয়েছে। আর যেহেতু বিসমিল্লাহর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জাতি নাম

ও গুনবাচক নাম উভয়টি রয়েছে তাই তাতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ যিকির পাওয়া গিয়েছে।

২য় উত্তর: কোন কোন হাদীছবিশারদ বলেছেন, ইমাম বোখারী রহ. কোরআন-হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ করে হাদীছ গ্রহণ করার জন্য যে কঠোর শর্তসংবলিত মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন, হামদের হাদীছটি যদিও ছহীহ কিন্তু তার গৃহীত শর্ত মুতাবেক হয়নি। তাই কিতাবের প্রারম্ভে হামদ লিখেননি।

৩য় উত্তর: আল্লামা যুরকানী রহ. শরহে মুয়াত্তায় লিখেছেন, অনুসন্ধানের পর দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দেওয়ার সময় হামদ দ্বারা আরম্ভ করতেন এবং বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নিকট দাওয়াতের চিঠি লিখতেন শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করে। তদ্রূপ হুদাইবিয়া সন্ধির চুক্তিনামাও বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি মুবারকগুলোর কোনোটার শুরুতে ও চুক্তিনামার শুরুতে হামদ লিখেন নি, শুধু বিসমিল্লাহ লিখেছেন। বোখারী শরীফ যদিও চিঠি নয় বরং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকৃত হাজার হাজার হাদীছ সম্বলিত একটি বিশাল বিশুদ্ধ হাদীছগ্রন্থ তবে যেহেতু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠিসমূহ দ্বীনে ইসলামের দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের জন্য দিয়েছেন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির চুক্তিনামাও দ্বীন প্রচারের সুবিধার্থে করেছিলেন তাই ঐ চিঠি ও লেখার উপর কিয়াস করে বুখারী শরীফের প্রথমে শধু বিসমিল্লাহ লিখেছেন হামদ লিখেন নি। কারণ, চিঠিগুলো যেভাবে লিখিত জিনিষ এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য লিখা হয়েছে তদ্রূপ বোখারী শরীফও একটি লিখিত ধর্মগ্রন্থ যা ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসারের জন্য লিখা হয়েছে।

ইমাম বোখারী রহ. এর আরেকটি ইজতিহাদ ও কিয়াসের উদাহরণ

তিনি কিতাবুল ইলমের মধ্যে নিম্নের ইবারত দ্বারা একটি বাব তথা অধ্যায় কায়েম করেছেন : باب تعليم الرجل أمته وأهله

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো, পুরুষ নিজের দাসী ও পরিবারকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া। কিন্তু উক্ত শিরোনামের অধীনে যে হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে শুধু দাসীকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার ফযীলতের বয়ান করা হয়েছে;

পরিবারের শিক্ষাবিষয়ক কোন আলোচনা নেই অথচ তারজুমাতুল বাব তথা শিরোনামের সাথে তার অধীনে বর্ণিত হাদীছের মিল থাকা জরুরি।

তার উত্তর হলো, ইমাম বোখারী রহ. উক্ত হাদীছে বর্ণিত দাসীকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়ার ফযীলতের উপর কিয়াস করেছেন পরিবারকে দ্বীনিশিক্ষা দেয়াকে। কেননা, মানুষ যদি দাসীকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার কারণে হাদীছে ঘোষিত ছাওয়াবের হকদার হতে পারে তাহলে বিবি-বাচ্চাকে দ্বীনি ইলম শিক্ষাদানে ছাওয়াবের হকদার হওয়াটা আরো উত্তমরূপে সাব্যস্ত হবে। কেননা, মানুষের উপর বিবি-বাচ্চাদের হক দাসীর হকের চেয়ে অনেক বেশী।

মোদ্দাকথা, তিনি মানছুছের উপর কিয়াস করে গাইরে মানছুছ তথা হাদীছে অল্লিখিত নয় এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে উক্ত ফযীলত সাব্যস্ত করেছেন; আর এইটার উপরই ভিত্তি করে শিরোনামে (وأهله) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এধরনের শতশত কিয়াস তিনি করেছেন। এখানে উদাহরণস্বরূপ দু'টি পেশ করা হলো।

ইমাম বোখারী রহ. কর্তৃক অন্যান্য ইমামদের ইজতিহাদের মূল্যায়ন

ইমাম বোখারী রহ. যেভাবে নিজে কিয়াস ও ইজতিহাদ করেছেন তেমনিভাবে তিনি তার পূর্বের মুজতাহিদগণের ইজতিহাদকে মূল্যায়নও করেছেন এবং অনেক ইজতিহাদী ব্যাপারে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কিতাবুল ইলমের বাবুল কিরাআত ওয়াল আরয (باب القراءة والعرض) অর্থাৎ হাদীছের শাগরিদ যদি শায়খকে হাদীছ পড়ে শুনায় কিন্তু উস্তাদ না পড়েন তাহলে ঐ উস্তাদকে শুনানোর ভিত্তিতে শিষ্য উস্তাদের পক্ষ থেকে হাদীছ রেওয়ায়ত করতে পারবেন কিনা?

ইমাম বোখারী রহ. এর মতে বরং জমহুরের মতে তা জায়েয হবে। সেই বিষয়ে তিনি কয়েকজন ইমামুল হাদীছ ওয়াল ফিকহ, তাবে'ঈ ও তবেতাবে'ঈ এর নাম স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেন, যার ইবারত হলো :

وراي الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة

"হাসান বাছরী, সুফয়ান ছাওরী ও ইমাম মালেক রহ. উক্ত পদ্ধতি অর্থাৎ শিষ্য উস্তাদকে পড়ে শুনানো অতঃপর রেওয়ায়ত ও বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন" যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম বোখারী রহ. ও তথাকথিত আহলে হাদীছ

ইমাম বোখারী রহ. উসূলে ইজতিহাদ ও ফিকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম শাফে'ঈ রহ. এর মুকাল্লিদ ও অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি ফুরু'আত তথা নবাবিষ্কৃত খুঁটিনাটি আহকাম ও মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রাখতেন। উক্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তিনি বোখারী শরীফের লিখা শুরু করতেই ইজতিহাদ ও কেয়াস করেছেন। তাছাড়া তিনি স্বীয় ছহীহ বোখারীর বাব তথা অধ্যায়সমূহের শিরোনাম কায়েম করতে বহু ইজতিহাদ ও কেয়াস করেছেন, যার নযীরও পেশ করা হয়েছে। আবার তিনি পূর্বের মুজতাহিদগণের ইজতিহাদসমূহকে অনেক জায়গাতে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গাইরে মুকাল্লিদের প্রশ্নোল্লিখিত ফতোয়া মতে ইমাম বোখারী রহ. তাকলীদ করে মুশরিক ও বেদ'আতী হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)। আর তিনি ইজতিহাদ ও কিয়াস করে শয়তানী কাজ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)। তারা মুজতাহিদের ইজতিহাদতো দূরের কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদকেও শরী'আতের দলীল হিসেবে বিশ্বাস করে না। যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। তার বিপরীত ইমাম বোখারী রহ. বহু জায়গাতে তাঁর পূর্বের মুজতাহিদগণের ইজতিহাদকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। যার প্রকাশ্য নযীর এইমাত্র পেশ করা হলো। অথচ তথাকথিত আহলে হাদীছ ভাইয়েরা কথায় কথায় ইমাম বোখারী রহ. ও তাঁর কিতাবের হাওলা পেশ করার চেষ্টা করে। তাদের এই দ্বিমূখী নীতি ও আচরণ মুনাফেকী ও ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই না।

তাদের অনৈতিক দাবী : একটি চমৎকার উদাহরণ

তাদের উদাহরণ হলো; একটি কাঁঠাল গাছ নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। মীমাংসার জন্য এই দুইব্যক্তির একজন প্রস্তাব দিলো এলাকার বড় হুযুর এইব্যাপারে যে ফয়সালা দিবেন তা আমি মেনে নিবো;অপর ব্যক্তি বলল, কাঁঠাল গাছটি যদি আমার ভাগে পড়ে তাহলে বড় হুযুরকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবো, নতুবা নয়। তারা ইমাম বোখারী রহ. কে নিজেদের সুবিধার্থে কয়েকটি মাসআলার ব্যাপারে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে, যেগুলোর ব্যাপারে পূর্ব থেকে ইমাম ও মুজতাহিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেসমস্ত আহকামের ব্যাপারে সাংঘর্ষিক ও দ্বিমুখী হাদীছ রয়েছে। যেমন; রুকু করতে ও

রুকু থেকে উঠতে হাত উঠানোর মাসআলা। ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ার পর মুক্তাদিরা আমীন বড় আওয়াযে বা নিম্নস্বরে পড়ার মাসআলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো কোনো মুজতাহিদ নিজের ইজতিহাদের আলোকে রুকুতে হাত উঠানোর হাদীছকে আমলের জন্য প্রাধান্য দিয়েছেন। আর কোনো কোনো মুজতাহিদ ঐ হাদীছ মানসূখ বলেছেন এবং হাত না উঠানোর হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তদ্রূপ আমীন উচ্চৈঃস্বরে বলা কিংবা নিম্নস্বরে বলার মাসআলা। ইমাম বোখারী রহ. শাফে'ঈ মাযহাবের অনুকরাণার্থে হোক কিম্বা নিজের ইজতিহাদী ফিকিরের আলোকে হোক হাত উঠানো ও আমীন উচ্চৈঃস্বরের বলার দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। গাইরে মুকাল্লিদরা এটাকে পুঁজি করে বোখারী শরীফের হাওলা দিয়ে ফিৎনার আগুন জ্বালিয়েছে এবং সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ উপরি উল্লিখিত বাস্তব বিবরণ দ্বারা পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, ইমাম বোখারী ও বোখারী শরীফ দ্বারা প্রমাণ দেয়া ও তাঁর রেফারেন্স দেয়ার কোন অধিকার তাদের নেই।

ইমাম বোখারী রহ.এর রায়ের বিরুদ্ধে তথাকথিত আহলে হাদীছদের ফতোয়া

ইমাম বোখারী রহ. ছহীহ বোখারী শরীফের ২য় খণ্ড, ৯২৬ পৃষ্ঠায় মুসাফাহাবিষয়ক দু'টি অধ্যায় কায়েম করেছেন। প্রথমটির শিরোনাম হলো, বাবুল মুছাফাহা (باب المصافحة)। তার অধীনে চারটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং তার মাধ্যমে মুছাফাহার সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন। প্রথম হাদীছ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন অবস্থায় তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন যে অবস্থায় আমার হাতের তালু রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই হাত মোবারকের ভিতরে ধরা ছিলো।

ইমাম বোখারী রহ.স্বীয় ইজতিহাদের আলোকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণিত উক্ত হাদীছ দ্বারা এবং তারপরে বর্ণনাকৃত তিনটি হাদীছ দ্বারা মুছাফাহাকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন।

দ্বিতীয় শিরোনামটি হচ্ছে,

وصافح حماد بن زيد إبن المبارك بيديه

অর্থাৎ তবে-তাবে'ঈন ইমামুল মুহাদ্দিছীন ও মুজতাহিদ হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ তৎকালীন আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদীছ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের সাথে দুই হাতে মুছাফাহা করেন।

ইমাম বোখারী রহ.উল্লিখিত দুই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমামুল হাদীছ ও মুজতাহিদ তবেতাবে'ঈর আমল বর্ণনা করে দুই হাতে মুছাফাহাকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু গাইরে মুকাল্লিদ মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ ইসমাঈল গাইরে মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে তার লিখিত পুস্তিকা 'আততোহফাতুল হুসনা' ৩৯ পৃষ্ঠাতে মন্তব্য করেন ''আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীছের সাথে মুছাফাহার কোনো সম্পর্ক নেই"। তার অর্থ হলো, এই ব্যাপারে ইমাম বোখারী রহ.এর ইজতিহাদ অবাস্তব ও ভুল।

হাদীছশাস্ত্রের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র তবেতাবে'ঈর দুই হাতে মুছাফাহা সম্পর্কে মন্তব্য করেন " আমাদের মতে ছাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজ শরী'আতের দলীল নয়। তাই তাবে'ঈন, তবেতাবে'ঈনদের কথা ও কাজসমূহ কিভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে"।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! উপরে ছহীহ হাদীছে সাব্যস্ত করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে প্রথম উত্তম উম্মত, তারপর তাবে'ঈনদেরকে তারপর তবেতাবে'ঈনদেরকে উত্তম উম্মত তথা ইসলামের প্রথম তিনযুগের মুসলমানদের ইলম, আমল, ইজতিহাদ ও ইজমা ইত্যাদিকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য সনদ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইমাম বোখারী রহ. সেই দৃষ্টিতে দুই হাতে মুছাফাহাকে সুন্নত সাব্যস্ত করার জন্য দুই আযীমুশশান তবেতাবে'ঈ মুহাদ্দিছের আমল নকল করেছেন। গাইরে মুকাল্লিদরা শিয়াদের ন্যায় ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন ও তবেতাবে'ঈন হযরাতের আমলকে অবমূল্যায়ন করে উড়িয়ে দিয়েছে। আর ইমাম বোখারী রহ. এর ইজতিহাদ ও দলীলের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছে। আমি উপরে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেছিলাম কাঁঠাল গাছ আমার ভাগে থাকলে বড় হুযুরকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবো। এই প্রতারক ও ধোঁকাবাজ দলটি নিজেদের স্বার্থে কয়েকটি ব্যাপারে ইমাম বোখারী রহ. এর দোহাই দিয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে ইমাম বোখারী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত ।

মুসলমানদেরকে উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝে নিতে হবে, বোখারী শরীফ শুধু হাদীছের কিতাব নয় বরং হাদীছের সাথে সাথে তা একটি

ইজতিহাদও ও ফিকাহর কিতাবও বটে। ইমাম বোখারী রহ. ইজতিহাদের মধ্য দিয়ে ছহীহ বোখারী শরীফ আরম্ভ করেছেন এবং ইজতিহাদের মধ্য দিয়ে খতম করেছেন। তাই এ কিতাবটি মুকাল্লিদদের সনদের কিতাব। গাইরে মুকাল্লিদদের জন্য তার নাম উচ্চারণ করা ও তা স্পর্শ করারও অধিকার নেই।

ইমাম আবু হানীফা রহ.কিয়াসের উপর হাদীছকে প্রাধান্য দিতেন (নামাযে অট্টহাসির ব্যাপারে উত্তর)

নামাযের মধ্যে (ক্বাহক্বাহা) অর্থাৎ অট্টহাসি দিলে নামায ও অযু উভয়টা ভেঙ্গে যাবে, যা কুদুরী কিতাবে লিখা হয়েছে তা ইমাম আবু হানিফা রহ.এর রায় অনুযায়ী লিখা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. উক্ত রায় একটি ছহীহ্ হাদীছের ভিত্তিতেই কায়েম করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. তাঁর লিখিত হাদীছের কিতাব 'কিতাবুল আছার' এ হাদীছটি ছহীহ্ সনদের মাধ্যমে এভাবে লিখেছেন-আমাদেরকে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, তাঁকে মানসুর ইবনে যাযান হাসান বসরী রহ. এর রিওয়ায়েতের মাধ্যমে হাদীছ বয়ান করেছেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন, ঐ সময় একজন অন্ধ মুসলমান নামাযের জামাতে অংশ গ্রহণের জন্য কেবলার দিক থেকে আসছিলেন। হঠাৎ তিনি হোঁচট খেয়ে একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন নামাযরত কয়েকজন মুছল্লী উক্ত ঘটনা দেখে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর বললেন, "তোমরা যারা নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিয়েছ তারা যেন আবার অযু করে নেয় এবং নামায পুনরায় পড়ে নেয়" (কারণ তাদের অযু নামায উভয়টা ভেঙ্গে গেছে)। জাওহারুন নকী কিতাবের খ.১, ৪২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেনঃ

ثم قال ابن مندة فى معرفة الصحابة روى أبو حنيفة عن منصور ابن زاذان عن الحسن عن معبد بن أبى معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قهقه في صلوته أعاد الوضوء والصلوة (الجوهر النقي لابن التركماني ١ ١٤٦٠)

অর্থাৎ ইবনে মানদা রহ.'মা'রিফাতে ছাহাবা' নামক কিতাবে লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. মানসুর ইবনে যাযান রহ. থেকে, তিনি হাসান বসরী রহ. থেকে, তিনি ছাহাবিয়ে রাসুল মা'বাদ ইবনে আবী মা'বাদ রা. থেকে, তিনি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিবে সে যেন অযু এবং নামায উভয়টা পুনরায় আদায় করে নেয়। অর্থাৎ আবার অযু করে উক্ত নামায দ্বিতীয়বার আদায় করে নেয়। তারপর তিনি বলেন, উক্ত হাদীছটি ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এবং আসাদ ইবনে আমর রিওয়ায়েত করেছেন। উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীছটি ইমাম আবু হানিফা রহ থেকে মুসনাদ ও মুরসাল দু'প্রকারে রিওয়ায়েত করা হয়েছে। অর্থাৎ একবার হাদীছের রাবী ছাহাবীর নাম ছাড়া সংক্ষেপে তাবেঈর নাম বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছটি রিওয়ায়েত করেছেন। আরেকবার স্বয়ং রাবী ছাহাবীর বর্ণনার মাধ্যমে রিওয়ায়েত করেছেন। শাইখ ইবনে আদী 'কামেল' নামক কিতাবে লিখেছেন, উক্ত হাদীছটি হাসান বসরী, কাতাদা, ইব্রাহীম নখ'য়ী এবং যুহুরী (তাবেঈগণ) মুরসাল এবং মুসনাদ উভয়রূপে রিওয়ায়েত করেছেন। তবে প্রত্যেক রিওয়ায়েতের মূল হল তাবেঈ আবুল আলীয়া। তার মুরসাল রিওয়ায়েত গুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে আদী শেষ রায়ে বলেছেন,

ولكن سائر أحاديثه مستقيمة صالحة

"কিন্তু তাহক্বীক্বের পর সাব্যস্ত হয় যে, তাঁর সমস্ত হাদীছগুলো সনদের দৃষ্টিতে মজবুত ও সুদৃঢ় এবং ভাল তথা গ্রহণযোগ্য।"

আর উক্ত হাদীছটি হাদীছের কিতাব মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের মধ্যে সহীহ্ সনদের মাধ্যমে মুরসাল হিসেবে রিওয়ায়েত করা হয়েছে। (উদ্ধৃতি: ই'লাউস সুনান; باب نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة
(নামাযে অট্টহাসি দ্বারা অযু ভঙ্গের অধ্যায়)। তেমনিভাবে উক্ত হাদীছটি ইমাম বায়হাকীর সুনানে কুবরা ১ম খ.১৪৬ প., কানযুল উম্মাল ২৭ খ. ৮৪ পৃ., আবু দাউদ শরীফ ১ম খ. ৭৫ পৃ., দারে কুতনী ১ম খ. ১৬৭ পৃ.তে রিওয়ায়ত করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা, ইমাম আবু হানীফা রহ.উক্ত সহীহ্ হাদীছের ভিত্তিতে বলেছেন, নামাযে অট্টহাসি দিলে অযু ও নামায উভয়টা ভেঙ্গে যায়। তবে হাদীছটির ব্যাপারে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কিরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেকে যয়ীফ (দুর্বল) বলেছেন, আর অনেকে সহীহ্ বলেছেন, যার বর্ণনা আমার আলোচনাতে এসেছে। উপরে লিখা হয়েছে, কোন হাদীছ সহীহ্ বা যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারটা কোন আয়াতে করীমা বা কোন সহীহ্ হাদীছ দ্বারা

সরাসরিভাবে সাব্যস্ত হয়নি, বরং মুজতাহিদীন ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম প্রত্যেকে কুরআন হাদীছের আলোকে রিসার্চকৃত নিজ নিজ শর্তাবলীর ভিত্তিতে হাদীছকে সহীহ্ বা যয়ীফ বলে থাকেন। তাই ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর প্রধান শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মদ রহ. ছাড়াও আরো অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরামের তাহক্বীক ও ইজতিহাদী রায় মতে হাদীছটি সহীহ্ সাব্যস্ত হয়। যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তাই কয়েকজন মুহাদ্দিসীনে কেরাম উক্ত হাদিসকে তাদের ইজতেহাদী রায় মতে য'য়ীফ বলেছেন। তা দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ.এর দলিলের উপর কোন আঘাত লাগবে না। কারণ, তাঁর তাহ্ক্বীক অনুযায়ী অনুরূপ আরো অনেক মুহাদ্দিছীনে কেরামের তাহ্ক্বীক অনুযায়ী উক্ত হাদীছ ও হাদীছের সনদ সহীহ। তাই তাঁর দলিলও সহীহ। এখন প্রশ্ন হয়, ইমাম আবু হানিফা রহ.হাসান বসরী রহ.এর সনদের মাধ্যমে হাদীছটি মুসনাদ-মুরসাল উভয় প্রকারে রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু হাসান বসরী রহ.কে উক্ত মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেছেন, উচ্চৈঃস্বরে হাসি দ্বারা নামায ভেঙ্গে যাবে অযু ভাঙ্গবে না। তার উক্ত উত্তর ও স্বীয় রেওয়ায়েতকৃত হাদীছের মধ্যে সংঘর্ষ সাব্যস্ত হল এর হেতু কী? তার উত্তর উক্ত হাদীছটি হাসান বছরী রহ.থেকে বিভিন্ন রূপে নকল করা হয়েছে তাতে কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। হতে পারে হাসান বছরী রহ.এর নিকট উক্ত হাদীছ পৌঁছার পূর্বে তিনি অট্টহাসির দ্বারা অযু ভঙ্গ না হওয়ার কথা বলেছেন। ঐ ব্যাপারে এ ধরণের যেকোন মন্তব্য উত্তর ধরে নিতে হবে। কারণ, তাঁর থেকে এ মর্মে কোন পরিস্কার বর্ণনা নেই যে, হাসির ব্যাপারে আমার রেওয়ায়েতকৃত হাদীছটি য'য়ীফ। অতএব, তা মতে আমল বা ফতওয়া ছেড়ে দিলাম। আর যদি যে সমস্ত মুহাদ্দিছীনে কেরাম উক্ত হাদীছকে যয়ীফ বলেছেন, তাদের মত ধরা হয় তাহলেও অট্টহাসির ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মাযহাব নিয়মতান্ত্রিকভাবে দলিলভিত্তিক সাব্যস্ত হবে। দলিল,

لما فى إعلاء السنن باب نقض الوضوء من القهقهة نقل فيه قول ابن خزيمة نصه الحنيفة متفقون على ان مذهب ابى حنيفة ان ضعيف الحديث عنده أولى من الراى وفيه عن التحفة المرضية صـ٢٧٠ وقال الحافظ ابن تيمية إثبات الحسن اصطلاح الترمذى وغير الترمذى من أهل الحديث ليس عندهم إلاصحيح وضعيف والضعيف عندهم ما انحط عن درجةالصحيح، ثم قد يكون

متروكا وهو ان يكون متهما أو كثير الغلط وقد يكون حسنا بان لايتهم بالكذب وهذامعنى قول احمد: العمل بالضعيف أولى من القياس

উপর্যুক্ত ইবারতের সারমর্ম হল, মুহাদ্দিস ইবনে খুজাইমা বলেছেন যে, হানাফী মাযহাবের ফক্বীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মাযহাব হল, ক্বিয়াসের সাথে আমল করার চেয়ে যয়ীফ হাদীছের সাথে আমল করা উত্তম। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.থেকে নকলকৃত ইবারতের সারমর্ম হল, মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে যয়ীফ হাদীছ যদি 'মাতরূক' না হয় অর্থাৎ তার কোন রাবী মিথ্যায় অভিযুক্ত না হয় এবং ঐ হাদীছের সনদ বা মতনে বেশী ভুল অর্থাৎ সংশোধনের অযোগ্য ভুল পরিলক্ষিত না হয় তাহলে তাকে 'হাদীছে হাসান' বলা হয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহ. এর মতও এ ধরনের যয়ীফ হাদীছের সাথে আমল করা ক্বিয়াসের (রায়) থেকে উত্তম। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম জয়ীফ হাদীছের সাথে আমল করার জন্য আরো কিছু শর্ত দিয়েছেন। যেমন, ঐ জয়ীফ হাদীছের বিপরীত কোন সহীহ্ হাদীছ বা ইজমায়ে ছাহাবা না থাকা। আলহামদুলিল্লাহ অট্টহাসির হাদীছের সাথে আমল করার জন্য উল্লিখিত শর্তাবলী বিদ্যমান আছে। কারণ, উক্ত হাদীছের সনদে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সম্বন্ধে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। আর ঐ হাদীছে উল্লেখযোগ্য কোন ভুলও নেই। আর উক্ত হাদীছের বিপক্ষে কোন সহীহ্ হাদীছ বা ইজমায়ে ছাহাবা নেই অর্থাৎ এ মর্মে কোন হাদীছ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অট্টহাসির দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.তাঁর কিতাব 'মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া' ২০খ. ৩০৪পৃ.তে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.সম্পর্কে প্রশংসামূলক শিরোনাম কায়েম করেছেন,

وابو حنيفة يعمل بالاحاديث ولو خالفت القياس

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ.সর্বদা হাদীছের উপরই আমল করতেন। যদিও তা কিয়াস (রায়) বিরোধী হত। অতঃপর তিনি লিখেছেন, যারা মনে করে ইমাম আবু হানিফা বা অন্য কোন ইমাম কিয়াসের সাথে আমল করে সহীহ্ হাদীছের বিরোধিতা করেছেন তারা অত্যন্ত ভুল করেছেন। তাদের এ ভুল কুধারণার কারণে সৃষ্টি হয়েছে অথবা তাদের কুপ্রবৃত্তির কারণে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর তিনি ইমাম সাহেবের প্রশংসা করতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ লিখেছেনঃ

فهذا ابو حنيفة يعمل بحديث التوضى بالنبيذ فى السفر مع مخالفة القياس وبحديث القهقهة فى الصلوة مع مخالفة القياس لاعتقاده صحتهماوكان ائمة الحديث لم يصحوهما

অর্থাৎ আবু হানিফা রহ.সফরের মধ্যে স্বাভাবিক পানি না থাকা অবস্থায় নবীযে তমর (খেজুর ভিজানো পানি) দ্বারা অযু জায়েয হওয়ার হাদীছ মতে আমল করতেন। অথচ তা কিয়াস বিরোধী। তদ্রূপ তিনি কিয়াস বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নামাযে অট্টহাসি দ্বারা অযু ও নামায উভয়টা ভেঙ্গে যাওয়ার হাদীছ মতে আমল করতেন ও ফতওয়া দিতেন। কারণ তাঁর শর্ত ও তাহক্বীক অনুযায়ী উভয় হাদীছ সহীহ্। যদিও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের মতে সহীহ্ নয় বরং যয়ীফ। উপরে তাফসীল লিখা হয়েছে যে, অট্টহাসির হাদীছকে আরও অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহীহ্ বলেছেন। আরও লিখা হয়েছে, যয়ীফ হাদীছ মতে আমল করা কিয়াস ও যুক্তির সাথে আমল করার চেয়ে উত্তম। তাহক্বীকের আলোকে আরও লিখা হয়েছে, প্রকৃত দৃষ্টিতে 'জয়ীফে গাইরে মাতরূক' 'হাদীছে হাসান' যা দলিলের যোগ্য ও আমলেরও যোগ্য।

সারকথা, ইমাম আবু হানীফা রহ.সহীহ বা হাসান হাদীছের মতে আমল করে নামাযে অট্টহাসির দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন। আর তা কুদুরী কিতাবে লিখা হয়েছে। গাইরে মুকাল্লিদ মাওলানা হাদীছের বিরোধী তার যুক্তি ও কিয়াস পেশ করেছেন এবং হাদীছের আমলকে উড়িয়ে দিয়ে সরলমনা সাধারণ মুসলমানদেরকে হানাফী মাযহাবের উপর ক্ষেপানোর হীন চেষ্টা করেছেন। যা তাদের চিরাচরিত ধোঁকাবাজির বহিঃপ্রকাশ।

কুদূরী কিতাব সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর

বিশ্বস্ত লোকের লিখনী ও মুখনিঃসৃত বাণী গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সনদ

মুহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগভী রহ.(মৃতঃ ৫১৬ হি.) হাদীছের কিতাব মাছাবীহ লিখেছেন, যার মধ্যে কোনো সনদের উল্লেখ করেননি, তারপরও তা দ্বারা মুহাদ্দিছীনে কেরাম ও হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছেন। প্রায় তিনশত বছর পরে অর্থাৎ ৮০০ হিজরীতে ইমাম শায়খ ওয়ালী উদ্দীন রহ. তাঁর উস্তাদ আল্লামা তীবি রহ.এর হুকুমে এবং সমকালীন আলেমদের দরখাস্তে শুধু সনদের প্রথম ব্যক্তির নাম লিখে দেন। যেমন 'আন উমর ইবনে খাত্তাব রা.ক্বালা (عن عمربن الخطاب قال:) ইত্যাদি এবং শেষভাগে যে কিতাব থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন তা লিখে দেন, যেমন; রাওয়াহুল বোখারী ও মুসলিম ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ণ সনদ লিখেন নি, তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ তা অধ্যয়ন করেন এবং তা থেকে উপকৃত হন। আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ ছিহাহ সিত্তার দরস ছিলো না, শুধু মিশকাত শরীফের দরস ছিলো। তারপরও এই সংশয় কখনো কারো মনের কোণায়ও উঁকি মারেনি যে, বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ থেকে গ্রহণ করেছেন তা সত্য না মিথ্যা? প্রথম রাবী ছাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়নি। তিনি তাদের আটশত বছর পরের লোক, তারপরও তিনি বিশ্বস্ত হওয়ায় কারো মনে এ প্রশ্ন ও সন্দেহ পর্যন্ত জাগেনি যে, তার সাথে কোনো ছাহাবীর সাক্ষাত হয়নি, তারপরও তিনি ছাহাবায়ে কেরামের রেফারেন্স দিয়ে কিভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন। তদ্রূপ ইমাম বোখারী রহ. বোখারী শরীফে ৭৩৯৭টি হাদীছ সনদসহ লিখেছেন আর তা'লিকাতে বোখারী অর্থাৎ সনদ ছাড়া ১৩৪১টি হাদীছ লিখেছেন। যেহেতু তিনি বিশ্বস্তলোক সেহেতু উম্মতের সর্বস্তরের লোক তাঁর সনদছাড়া হাদীছগুলোকেও গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম কুদূরী রহ. অত্যন্ত বিশ্বস্তলোক ছিলেন, তাঁর লেখাই ছিলো সনদ। তাঁর লিখার ব্যাপারে কারো মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি যে এইটা ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন নাকি বলেন নি? তাছাড়া তাঁর কিতাব পূর্বের হানফী কিতাব, ইমাম মুহাম্মদ রহ.কর্তৃক রচিত জামে ছগীর, জামে কবীর, মাবসূত,

যিয়াদাত, সিয়রে ছগীর এবং সিয়রে কাবীর ইত্যাদি কিতাবের সাথে তাঁর কিতাবের মিল ছিলো।

প্রশ্নোল্লিখিত গাইরে মুকাল্লিদ মাওলানা সরলমনা মুসলমানদেরকে হানফী মাযহাব সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি ও ধোঁকা দেওয়ার জন্য কুদূরী কিতাবের সনদের ব্যাপারে অহেতুক উক্তি ও মন্তব্য করেছেন।

অযুতে নিয়্যতের ব্যাপারে আহলে হাদীছ মাওলানার উক্তির জবাব

আহলে হাদীছ মাওলানা বলেছেন, إنما الأعمال بالنيات (ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত) এই হাদীছটি দ্বারা অযুতে নিয়্যত করা ফরয সাব্যস্ত হয়। কিন্তু হানফীদের কুদূরী নামক কিতাবে লিখা হয়েছে অযুতে নিয়্যত করা সুন্নত। আমরা আহলে হাদীছেরা উক্ত হাদীছ অনুযায়ী অযুতে নিয়্যত করাকে ফরয বলি, কিন্তু হানফীরা উক্ত ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে অযুতে নিয়্যত করাকে সুন্নত বলে। অপরদিকে উক্ত কিতাবে লিখা হয়েছে যে, তায়াম্মুমে নিয়্যত করা ফরয, অথচ তায়াম্মুম হলো অযুর নায়েব তথা স্থলাভিষিক্ত।

আহলে হাদীছ মাওলানার উক্ত উক্তির জবাব জানতে প্রথমে হাদীছটির প্রেক্ষাপট জানতে হবে।

এই হাদীছের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কা শরীফে উম্মে কাইস নামক এক মহিলাকে এক ব্যক্তি বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মে কাইস রা. বলেছিলেন, আমি হিজরত করবো আপনিও যদি হিজরত করে মদীনা শরীফে যান তাহলে বিয়ে হবে। এই কথার উপর ভিত্তি করে উক্ত ব্যক্তিও হিজরত করেন। হিজরতের পর তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর এরশাদ করলেন,

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (صحيح البخاري : ١٠١)

"রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আমলসমূহের ফলাফল (ছাওয়াব) নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে নিয়্যত করবে তা সে পাবে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে হিজরত করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে

হিজরত করবে, সে দুনিয়া এবং মহিলাকেই পাবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি পাবেনা।" (ছহীহ বোখারী : খ.১, পৃ.১)

এই হাদীছের মর্মার্থ হলো, মুসলমান প্রত্যেক নেক কাজ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা মতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করবে নতুবা তা কবুল হবেনা। ইমাম বোখারী রহ. উক্ত হাদীছটি ছহীহ বোখারীর প্রথমে এনে সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যাতে যারা তাঁর এই হাদীছের কিতাবটি পড়বে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য পড়বে এবং পড়ায়। নতুবা কোনো লাভ হবে না তথা কোন ছাওয়াব পাবে না।

মোদ্দাকথা, নিয়্যতকে শুদ্ধ করা হাদীছের উদ্দেশ্য। হাদীছের উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রত্যেক কাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়্যত করতে হবে। যদি তা হয় তাহলে প্রত্যেক নেককাজে নিয়্যত করা ফরয হয়ে যাবে। যেমন আযান দেওয়া একটি নেক কাজ, ইক্বামত দেয়া একটি নেক কাজ, মাসজিদে প্রবেশ করা একটি নেক কাজ। যদি প্রত্যেক নেক কাজে নিয়্যত ফরয হয় তাহলে উপরি-উল্লিখিত প্রতিটি কাজে নিয়্যত করা ফরয হয়ে যাবে, অথচ আযান, ইকামত ও মাসজিদে প্রবেশ করতে নিয়ত ফরয হওয়ার কথা কোনো ইমাম ও মুজতাহিদ বলেন নি। এই ব্যাপারে তাফসীল হলো, ইবাদত দুই প্রকার যথা:

১. ইবাদতে মাকছুদা যেমন, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব ইত্যাদি যেগুলো আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কোরআন মাজিদে সরাসরি হুকুম করেছেন।

২. ইবাদতে গাইরে মাকছুদা যেমন, অযু, আযান ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যখন নামায পড়ার ইচ্ছে করবে তখন মুখ, হাতগুলো ধৌত করবে, মাথা মাসেহ করবে, দুইপা ধৌত করবে। অন্য আয়াতে কারীমায় বলেছেন, যখন নামাযের জন্য ডাকা হবে অর্থাৎ আযান দেয়া হবে তখন তোমরা যিকিরের দিকে তথা নামাযের দিকে যাও। বুঝা গেলো যে, অযু ও আযান সোজাসুজি ইবাদত নয় বরং এগুলো নামাযের কারণে ইবাদত হয়েছে। প্রথম প্রকারকে ইবাদতে মাকছুদা তথা সরাসরি ইবাদত; দ্বিতীয় প্রকারকে ইবাদতে গাইরে মাকছুদা তথা মধ্যস্থতাকারী ইবাদত বলা হয়। প্রথম প্রকারের ব্যাপারে নিয়্যত করা সমস্ত ইমামগণের ঐকমত্যে ফরয। যা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে কারীমা যেমন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿ الكوثر: ٣﴾

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ (الأنعام:١٦٢)

ইত্যাদি আয়াতের চাহিদা মোতাবেক ফরয হয়েছে। কিন্তু ইবাদতে গাইরে মাকছুদার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, মধ্যস্থতাকারী ইবাদত মধ্যস্থ হিসেবে বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য তার ব্যাপারে নিয়ত ফরয নয়।

ইমাম শাফে'য়ী রহ. এর মতে উক্ত হাদীছ দ্বারা অযুতে নিয়্যত করা ফরয। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা অযুতে নিয়্যত করা সুন্নত সাব্যস্ত হয়েছে। নিয়্যত করলে ছাওয়াব পাবে নতুবা নয়। কিন্তু যদি বিপরীত নিয়্যত করে তাহলে ছাওয়াবতো পাবেই না, উল্টো গুনাহ হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি মাসজিদে নামাযের উদ্দেশ্যে প্রবেশ না করে বরং অন্য কোনো ব্যক্তির উপর জুলুম করা কিংবা মুছল্লীদের কোন বস্তু চুরি করার উদ্দেশ্যে মাসজিদে প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অবৈধ প্রেমের তাবিজ লিখার উদ্দেশ্যে অযু করে তাহলে উল্লিখিত দুই ব্যক্তি কোন প্রকারের ছাওয়াব তো পাবেই না বরং গুনাহগার হবে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, অযুর বিধানসম্বলিত আয়াতে করীমা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, অযু নামাযের মাধ্যম হিসেবে ইবাদত। আবার হাদীছ শরীফে আছে,

مفتاح الجنة الصلاة و مفتاح الصلاة الوضوء(سنن الترمذي-١٠ ٠١)

"নামায জান্নাতের চাবী এবং ওযু নামাযের চাবী"(তিরমিযি; খ.১, পৃ:১০)

চাবী যেভাবে তালা খোলার মাধ্যম তদ্রূপ অযুও নামাযের জন্য মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তার জন্য নিয়্যত করতে হবে না। নিয়্যত না করার কারণে ছাওয়াব থেকে সে মাহরূম হবে। সরাসরি ইবাদতগুলোর ব্যাপারে নিয়্যত করা ফরয, যাতে আল্লাহ পাকের ইবাদত গাইরুল্লাহর ইবাদত ও পূজা থেকে পার্থক্য হয়ে যায় এবং ইবাদতের দিক ঠিক হয়ে যায়। যেমন, নামায ফরয নাকি ওয়াজিব না সুন্নত না নফল ইত্যাদি। মধ্যস্থতাকারী ইবাদত যেহেতু ইবাদতে মাকছুদার ভূমিকাস্বরূপ নির্ধারিত ইবাদত, তাই তাতে গাইরুল্লাহর ইবাদতের সাথে সাদৃশ্যতার সম্ভাবনা নেই। অতএব, তার ব্যাপারে নিয়তের প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাতে নিয়্যত ফরয নয়। তাছাড়া যদি উক্ত হাদীছের মাধ্যমে ইজতিহাদের আলোকে অযুতে নিয়্যত করা ফরয সাব্যস্ত হয় তবে নামাযের অন্যান্য শর্ত যেমন নামাযীর কাপড় পাক, শরীর পাক, জায়গা পাক,

নামাযীর শরীরে কোন নাপাক জিনিস লাগলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করা ইত্যাদিতে পবিত্রতা অর্জন করার সময় নিয়্যত করা ফরয হওয়া দরকার। কিন্তু যারা অযুতে নিয়্যত করা ফরয বলেন, তারাও সেসব ব্যাপারে নিয়্যত ফরয বলেন না। বুঝা গেলো অযুর ব্যাপারেও তাদের ইজতিহাদ ঠিক হয়নি। বরং তাদের ইজতিহাদের আলোকে উক্ত হাদীছের ব্যাপকতার চাহিদা অনুযায়ী সকল আমলের জন্য নিয়্যত করা ফরয হওয়া দরকার। যেমন, আযান-ইকামত, মাসজিদে প্রবেশ ও ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করা ইত্যাদি কাজে নিয়্যত করা; অথচ কোন ইমাম ও মুজতাহিদ উল্লিখিত আমলগুলোর ব্যাপারে নিয়্যত করাকে ফরয বলেন নি। তাই শুধু অযুর ব্যাপারে নিয়্যত ফরয হবে অন্য কোন মধ্যস্থতাকারী ইবাদতে ফরয হবে না, যারাই এই রায় দিকনা কেন, তা প্রযোজ্য নয়। বরং এই ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর রায়টি বাস্তবতার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ, তাই গ্রহণের জন্য সেটাই প্রযোজ্য।

উক্ত হাদীছের আলোকে ইবাদতে গাইরে মাকছুদার জন্য তিনটি স্তর সাব্যস্ত হয়। যেমন হিজরতের ব্যাপারে যে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে তাও মধ্যস্থতাকারী ইবাদত। কারণ, হিজরত করার জন্য হুকুম করা হয়েছে দ্বীন হিফাযত করার জন্য ও দ্বীন কায়েম করার জন্য। এ কারণেই যখন মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে দ্বীন কায়েম হয়ে গেছে তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন, এখন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করার হুকুম নেই তাই তার ফযীলতও নেই।

মোদ্দাকথা, হিজরত ইবাদতে মাকছুদা নয় বরং ইবাদতের মাধ্যম। উক্ত হাদীছের আলোকে হিজরতের তিন স্তর বের করা হয়েছে।

১. রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করা।
২. দুনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করা।
৩. আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি বা দুনিয়া অর্জন বা মহিলাকে বিয়ে করা কোনোটার নিয়্যত না থাকা বরং কোনো নিয়্যতছাড়া হিজরত করা।

প্রথম প্রকারের হিজরত হলো উত্তম হিজরত, ফযীলত ও ছাওয়াব পাওয়ার হিজরত। দ্বিতীয় প্রকারের হিজরত হলো ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়া বরং গুনাহের হিজরত। তৃতীয় প্রকারের হিজরত দ্বারা ছাওয়াব ও গুনাহ কোনোটাই হবে না। তবে তিনো প্রকারের হিজরত মধ্যস্থতাকারী ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এই মর্মে আহনাফের মাযহাব হচ্ছে, অযুতে ছাওয়াবের নিয়্যত

করলে ছাওয়াব পাবে নতুবা পাবে না। আর যদি বিপরীত নিয়্যত করে তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে কোন মহিলার প্রেম অর্জনার্থে তাবীয লিখার জন্য অযু করে তাহলে ছাওয়াবের পরিবর্তে আরও গুনাহ হবে। আর যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কোনোটার নিয়্যত না করে তাহলে ছাওয়াব গুনাহ কোনোটা হবে না। তবে সর্বাবস্থায় মধ্যস্থতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ অযু ছহীহ হয়ে যাবে।

তাছাড়া সুরা ফুরকানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان: ٤٨)

"আমি আসমান থেকে পবিত্রকারী পানি অবতীর্ণ করেছি"(সূরা ফোরকান : ৪৮

আর সূরা আনফালে ইরশাদ করেন,

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[﴿الأنفال: ١١﴾

"আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি অবতীর্ণ করেন, তাদ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য "। (আনফাল : ১১)

আল্লাহ পাকের উল্লিখিত ঘোষণাদ্বয়ের দ্বারা বুঝা যায় পানি সৃষ্টিগত পবিত্র এবং পবিত্রকারী। তাই কোন ব্যক্তি নিয়্যত ছাড়াও অযু-গোসলেন জন্য পানি ব্যবহার করলে পবিত্র হয়ে যাবে। উপরে বলা হয়েছে, উসিলা ইবাদতগুলো যেহেতু ইবাদতে মাকছুদার ভূমিকা বা সহায়ক হিসেবে নির্ধারিত আছে তাই সেগুলোকে নির্ধারণ করার জন্য নিয়্যতের প্রয়োজন হয় না। পানি ইবাদতের মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু সৃষ্টিগত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পবিত্র করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে তাই পবিত্রতার জন্য উহা ব্যবহার করে, পবিত্রতার নিয়্যত না করলেও পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। হ্যাঁ যেহেতু নিয়্যত একটি নেক আমল তাই নিয়্যত করলে তার ছাওয়াব পাবে। উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে গৃহীত বিধানের ভিত্তিতেও ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, অযুতে নিয়্যত করা ফরয নয়। কিন্তু তায়াম্মুমের ব্যাপারে ব্যাতিক্রম। কারণ তায়াম্মুম হয় মাটি দ্বারা। অথচ মাটিকে সৃষ্টিগত পবিত্র ও পরিষ্কার করার জন্য তৈরী করা হয়নি বরং মাটি দ্বারা মানুষ অপরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ পবিত্র করা মাটির স্বভাবজাত নয়। একারণেই তায়াম্মুম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (النساء: ٤٣)

"তোমরা যদি পানির উপর সক্ষম না হও তাহলে পবিত্র মাটির ইরাদা কর।" অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যতে পবিত্র মাটি ব্যবহার কর।

তায়াম্মুম শব্দের অর্থ হলো, কছদ করা, ইচ্ছা করা ও নিয়্যত করা। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তায়াম্মুমের আয়াতে ইরশাদকৃত শব্দমতে আমল করার জন্যই তায়াম্মুমে নিয়্যত করা ফরয। অন্যদিকে অযুর আয়াতে আল্লাহ পাক শুধু তিন অঙ্গকে ধৌত করার জন্য ও এক অঙ্গকে মাসেহ করার জন্য হুকুম করেছেন। অযুর আয়াতে নিয়্যত করার হুকুম করা হয়নি বরং তার ইঙ্গিতও নেই। আল্লাহ পাকের ইরশাদ অনুযায়ী অযু আর তায়াম্মুমের মধ্যে ব্যবধানের কারণেই ইমাম আবু হানীফা রহ. তায়াম্মুমের ব্যাপারে নিয়্যত করা ফরয আর অযুর মধ্যে নিয়্যত করা ফরয নয় বলেছেন। গাইরে মুকাল্লিদ ভাইরা যেহেতু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ইলমী গভীরতা থেকে মাহরূম এজন্য তারা ছহীহ কথাগুলো বুঝেন না। গাইরে মুকাল্লিদ মাওলানা ধোঁকা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে হানফী মাযহাব থেকে দূরে সরানোর জন্য তথা পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রশ্নোল্লিখিত বিভ্রান্তিকর আলোচনা করেছেন। আর উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, অযুতে নিয়্যত ফরয হওয়া না হওয়ার সাথে উক্ত হাদীছের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ঘটনার চাহিদা ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক প্রকারের নিয়্যতকে শুদ্ধ করা। এই মর্মে কিতাব শুরু করার পূর্বেই নিয়্যত শুদ্ধ করার জন্যই ইমাম বোখারী রহ. ও মিশকাত শরীফের প্রণেতা উক্ত হাদীছকে নিজ নিজ কিতাবের প্রথমে লিখেছেন। ইমাম বোখারী রহ. উক্ত হাদীছটি বোখারী শরীফের সাত জায়গায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অযু সংক্রান্ত অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেন নি। বুঝা যায় তাঁর মতেও উক্ত হাদীছ দ্বারা অযুতে নিয়্যত করা ফরয সাব্যস্ত হয়নি।

যাহোক এই পর্যন্ত উক্ত হাদীছের ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদভিত্তিক আলোচনা লিখা হয়েছে। এখন আলোচনার প্রয়োজন তথাকথিত আহলে হাদীছ গাইরে মুকাল্লিদদের ব্যাপারে ।

প্রশ্নের ইবারত দ্বারাই প্রকাশ হয়েছে তাদের মূল আকীদা হলো যে, কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদ তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দ্বিতীয় মূল আকীদা তারা একমাত্র কোরআন-হাদীছের স্পষ্ট বাণী অনুযায়ী আমল করবে। এখন দেখা যায় উক্ত হাদীছের স্পষ্ট বাণীতে অযু সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। তাই গাইরে মুকাল্লিদ মাওলানা যে বলেছেন, আমরা আহলে হাদীছরা উক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে অযুতে নিয়্যতকে ফরয বলে থাকি। তার উক্ত আলোচনা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের আরও একটি তীক্ষ্ণ ধোঁকা হলো, তারা মুহতারাম মুজতাহিদ ও ইমামগণের ইজতিহাদের অনুকরণ করাকে

শিরক, হারাম ও বিদ'আত ইত্যাদি বলে প্রচার করে থাকে। কিন্তু তাদের মতানুযায়ী কোন মাসআলা যদি বলতে চায় আর তা কোনো স্পষ্ট আয়াত বা হাদীছের শব্দ দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তারা নিজেদের ইজতিহাদী রায়কে কোন হাদীছের সাথে সংযোজন করে সাধারণ মুসলমানদের নিকট (যারা কোরআন-হাদীছ কিছুই বুঝেনা) দাবী করে থাকে অমুক হাদীছ দ্বারা এই মাসআলা বা শর'য়ী হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত ধোঁকাবাজীর নযীর স্বরূপ উক্ত হাদীছটি যথেষ্ট। তাদের আর একটি মীরাছী ধোঁকাবাজী হলো, তারা হানফী মাযহাবকে ঘায়েল করার জন্য অনেক ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ইজতিহাদী দলীলসমূহের শরাণাপন্ন হয়ে থাকে । পরে সেগুলোকে নিজেদের দলীল হিসেবে পেশ করে। এই বেদ'আতী দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হক বেনারসী পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে উক্ত ধোঁকাবাজীর অভ্যাস পেয়েছে। সে শাফেয়ী মাযহাবের দলীল দ্বারা হানফী আলেমদের সাথে বহস, মুনাযারা করত। উক্ত হাদীছের ব্যাপারে তারাও শাফেয়ী মাযহাবের ইজতিহাদী দলীলকে হাতিয়ার বানিয়ে হানফী মাযহাবের মোকাবেলাত দাঁড়িয়েছে।

সারকথা তথাকথিত আহলে হাদীছদের দাবী, তারা একমাত্র আমল করবে আয়াতে কারীমা বা হাদীছের স্পষ্ট বাণীতে। অথচ উক্ত হাদীছের স্পষ্টভাষ্যে অযু সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। আবার তাদের মতে যে কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদের অনুকরণ-অনুসরণ করা শিরক, হারাম ও বিদ'আত। তাই একথা দ্বিপ্রহরের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, উপরিউক্ত হাদীছকে অযুতে নিয়্যত ফরয হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার কোনো প্রকারের অধিকার আহলে হাদীছের থাকতে পারেনা। গাইরে মুকাল্লিদ মাওলানা (যার বক্তব্য ইন্টারনেটে ছাড়া হয়েছে) সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্যই অযুতে নিয়্যত ফরয হওয়ার ব্যাপারে উক্ত হাদীছটি প্রমাণ হিসেবে প্রচার করছেন। মুসলমান ভাইদেরকে এই বেদ'আতী প্রতারক দল থেকে দূরে থাকতে হবে। মুসলমান ভাইরাও গাইরে মুকাল্লিদ মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনি যে অযুতে নিয়্যত ফরয বলেছেন আপনার থেকে আমরা ফরযের সংজ্ঞা জানতে চাই। স্পষ্ট হাদীছ দ্বারা ফরযের পরিচয় দিবেন কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদী রায় দ্বারা নয়। এই প্রশ্নের উত্তর তারা কেয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবেনা । এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহু তা'আলা পরে আরও তাফসীলী কথা লিখা হবে।

আমার সাথে আহলে হাদীছের সভাপতি ও সেক্রেটারী জনাব আব্দুল মতিন সলফী ও জনাব প্রফেসর আসাদুল্লাহ্ গালিবের সাক্ষাৎ ও ঐতিহাসিক ঘটনাঃ

আনুমানিক ১৯৯০ সাল বা তার কিছু আগে-পরের ঘটনা। সৌদি আরবের মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সলফীদের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষক জনাব শায়খ আবুল আরব সাদেক সাঈদ বাংলাদেশ সফরে আসেন। বাংলাদেশের তৎকালীন সলফীদের তথা আহলে হাদিসের সভাপতি জনাব আব্দুল মতিন সলফী ও সেক্রেটারী জনাব প্রফেসর আসাদুল্লাহ গালিব তাকে নিয়ে চট্টগ্রামস্থ জামেয়া ওবাইদিয়া নানুপুর (মাদ্রাসায়) আসেন। আরব থেকে শায়খ ও আরবী মেহমানদের আগমন দেখে আহলে মাদ্রাসা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হন। মাদ্রাসার মহাপরিচালক শাইখুল আরব ওয়াল আজম কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা শাহ্ সোলতান আহমদ নানুপুরী রহ. উক্ত শায়খকে অনেক কারণে আগে থেকে ভালভাবে চিনতেন ও জানতেন। আর তিনিও শায়খ নানুপুরী রহ. কে পূর্ব থেকে চিনতেন, গভীরভাবে মহাব্বত ও শ্রদ্ধা করতেন।

যা হোক, মেহমানগণ হযরত শায়খ নানুপুরী রহ. ও হযরত শাহ্ জমীর উদ্দিন সাহেব রহ. এবং অন্যান্য আসাতেযায়ে কিরামের সাথে কুশল বিনিময় ও নাস্তা ইত্যাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। অতঃপর তাদের চাহিদা মোতাবেক তাদের বয়ান শুনানোর জন্য মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষককে মসজিদে একত্রিত করা হয়। প্রথমে শায়খ আবুল আরব বয়ান করেন। তিনি তাওহীদের উপর এবং শিরক, বিদআতের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বয়ান করেন। অতঃপর আব্দুল মতীন সলফী সাহেব অনুরূপ শিরক ও বেদআতের বিরুদ্ধে এবং তাকলীদ তথা ইমাম মানার বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বয়ান করেন। তারপর জনাব প্রফেসর আসাদুল্লাহ গালিব বয়ান করেন। তিনি খোৎবার পর নিম্নোক্ত আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন,

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى الخ

আয়াতটির অনুবাদ করার পর তার সারগর্ভ খেতাব ও বক্তব্যের ভঙ্গিমা দ্বারা অনুমান হচ্ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বিদ্যা ও ইলেমের সাগর এসেছেন এবং নানুপুর মাদ্রাসায় অবস্থানকারী ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে ঐ সাগর থেকে কিছু পানি বিতরণ করছেন। আয়াতের অর্থ পেশ করার পর তিনি বললেন, উক্ত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় আল্লাহ তা'আলা চৌদ্দশত বছর

পূর্বে ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাহলে এখানে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর জায়গা কোথায়? সাথে সাথে উদাহরণ স্বরূপ তিনি একটি গ্লাস তলব করলেন। গ্লাসে পানি দিয়ে পূর্ণ করে নিজের দাবিটা স্পষ্ট করলেন। আরো বললেন, পানি পূর্ণ গ্লাসে আর কোন পানি জাতীয় জিনিস ঢুকানো সম্ভব নয়। তদ্রূপ পরিপূর্ণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে আর কোন মুজতাহিদ ইমাম ঢুকানো সম্ভব নয়। তাই কোন ইমামের তাকলীদ করা বা মাযহাব মানা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম। তিনি বক্তৃতা শেষ করার পর যোহর নামায আদায় করা হয়।

অতঃপর আমি শায়খ নানুপুরী রহ. এর নিকট আরয করলাম, আমি মেহমানদেরকে তাদের আলোচিত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। হযরত শায়খ বললেন, আমি তোমার চোখের মধ্যে তাপ দেখছি। তোমার তবিয়তের মধ্যে শীতলতা আসুক। তারা খানা খেয়ে অবসর হোক, তারপর গিয়ে প্রশ্ন করো। হযরত মাও. জমির উদ্দিন সাহেব রহ. বললেন, প্রশ্ন করার দরকার নেই, তারা মনে কষ্ট নিবে। আমি বললাম, তাদের বয়ানের দ্বারা মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সকলে ক্ষুব্ধ, যদি প্রশ্ন না করি তাহলে সবার মনে দুঃখ থেকে যাবে এবং তাদের দাবি বহাল থেকে যাবে। আমি আদবের সাথে প্রশ্ন করব যাতে তাদের মনে কষ্ট না যায়। অতঃপর আমি মেহমান খানায় গিয়ে তাদের সাথে ছালাম-কালাম করলাম। মাদ্রাসার উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকগণ আমাকে পরিচয় করে দিলেন যে, ইনি আমাদের মাদ্রাসার মুফতি সাহেব। তারপর আমি আরয করলাম, মেহমানানে কিরামের যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি আপনাদের খেদমতে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। তখন তারা বললেন, হ্যাঁ প্রশ্ন রাখতে পারেন। আমি বললাম, মসজিদে আপনাদের দীর্ঘ বয়ানের দ্বারা বুঝতে পারলাম, ইসলামের কোন ব্যাপারে কোরআন-হাদিস ছাড়া কোন মুজতাহিদ ইমামের কথা মানা যাবে না। এখন আমার প্রশ্ন হল, আপনার বয়ানের সময় যে লাউড স্পিকার(মাইক)ব্যবহার করলেন তা ব্যবহার করা জায়েয না নাজায়েয। যদি নাজায়েয হয় তাহলে আপনারা তা ব্যবহার করলেন কেন? আর জায়েয হলে কোরআনের কোন্ আয়াত বা কোন্ হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত?

আরবী মেহমান জিজ্ঞাসা করলেন, মুফতি সাহেব কি প্রশ্ন করলেন। তখন তারা তাকে প্রশ্ন বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর দেখা যায় তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায় এবং কপাল থেকে চিকন ঘাম বের হওয়া আরম্ভ হয়েছে।

আর যেন আমার প্রশ্নের সাথে সাথে আসাদুল্লাাহ গালিবের ইলমের সাগর শুকিয়ে গেল। তিনি কোন প্রকারের উত্তর দিতে না পেরে হতবাক হয়ে বসে রইলেন। তারপর আরবী মেহমান আমাকে লক্ষ্য করে বললেল,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানদেরকে সম্মান প্রদান করে। তখন আমি আরবিতে বললাম,

يا سيدى! السوال عن المسائل الشرعية هل هو يضاد الاكرام بل فى ظنى هو عين الاكرام

অর্থাৎ জনাব! মেহমানদের থেকে শরী'আতের কোন মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করা, এটা কি তাদের সম্মানের পরিপন্থী? বরং আমার ধারণা মতে আলেম মেহমান থেকে শরী'আতের মাসআলা জিজ্ঞাসা করা এটাই তাদের সম্মান। তখন আরবী মেহমান দিশেহারা হয়ে মেহমানদের সামনে বসা মাদ্রাসার ছোট ছাত্র ইমদাদ যে তাদের প্রথমে কোরআনে করীম শুনিয়েছে তাকে বললেন, ইয়া ইমদাদ ইক্বরা অর্থাৎ কোরআন পড়। তখন ইমদাদ কোরআন পড়া আরম্ভ করল। এই দিকে তারা চলে যাওয়ার জন্য সামান গুছানো আরম্ভ করলেন। অথচ তারা প্রথমে বললেন, আগামী রাত এখানে অবস্থান করবেন। আমি আরয করলাম, মেহমানানে কিরাম আপনারা আগামী রাত এখানে অবস্থান করার কথা বলেছিলেন, এখন কেন রওয়ানা হয়ে যাচ্ছেন? তখন তারা বললেন, কাজের ঝামেলা আছে। এখন চলে যেতে হবে। এই ওযর দিয়ে তারা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

তাকলীদের ব্যাপারে এ.ডি.সি জেনারেলের প্রশ্ন ও উত্তর

আমি চট্টগ্রামস্থ নানুপুর ওবাইদিয়া মাদ্রাসায় থাকা অবস্থায় আমার পরিচিত চট্টগ্রামের এ.ডি.সি জেনারেল একদা আমাকে প্রশ্ন করলেন, কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে ঈমান এনেছি। কালেমার প্রথমাংশে আল্লাহ আর দ্বিতীয়াংশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা কোথা থেকে এলো? তাঁর তাকলীদ করা আমাদের প্রয়োজন কেন? এই প্রশ্নের সাথে সাথে আমি বুঝতে পেরেছি যে, প্রতারকরা তাঁকে এই ব্যাপারে কুযুক্তি দিয়ে সহজে একটি গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাতের টেবলেট খাইয়ে দিয়েছে। আমি তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোরআন শরীফ পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়েছি। আমি বললাম, কার নিকট পড়েছেন? তিনি বললেন, মাও. আবু মুছা নিকট পড়েছি। আমি বললাম, কোরআন নাযিল হয়েছে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর উপর। আপনি মদীনা গিয়ে সরাসরী তাঁর নিকট কোরআন শিক্ষা না করে মাও. আবু মুছার থেকে কেন শিক্ষা নিলেন? এই কথা বলার পর কিছুক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। আমাকে কিছু বললেন না। আমিও তাঁকে আর কিছু বললাম না।

তিনি যদি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে আমি এইভাবে বিস্তারিত আলোচনা করতামঃ ইসলামী শিক্ষার প্রথম ফাউন্ডেশনই তাকলীদে শাখছীর উপর ভিত্তি। তাকলীদে শাখছী বলা হয়, এক ব্যক্তির উপর আস্থা বিশ্বাস রেখে দলীল তলব ব্যতীত তাঁর অনুকরণ করা। যে ছেলে যে উস্তাদের নিকট কোরআন পড়েছে, প্রথম দিন থেকে ঐ উস্তাদের উপর আস্থা-বিশ্বাস নিয়ে সবক পড়েছে। উস্তাদ বলেছে 'আলীফ' ছেলে বলেছে 'আলীফ'। উস্তাদ বলেছে 'বা' ছেলে বলেছে 'বা'। এইভাবে উস্তাদের মুখে মুখে শুনে সবগুলি হরফ শিখেছে। তার মনে এই প্রশ্ন আসেনি যে, উস্তাদ বলেছে এটা 'আলীফ' ওটা 'বা'। বাস্তবে এটা 'আলীফ' অথবা 'বা' কিনা? উস্তাদকে এই ব্যাপারে প্রশ্নও করেনি। এইভাবে হরফ (অক্ষর) শিক্ষা দেওয়ার পর বানান শিখিয়েছেন তারপর আস্তে আস্তে তাকে কোরআন শরীফ পড়ার যোগ্য হিসেবে তৈরী করে কোরআন মজীদের সূরা ফাতেহার সবক দিয়েছেন। অতঃপর এক সূরার পর আরেক সূরা, এইভাবে পুরা কোরআন মজীদ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ছেলের মনে কখনো এই প্রশ্ন আসে নেই যে, উস্তাদ আমাকে সূরা ফাতেহা থেকে শুরু করে কোরআন শরীফের শেষ সূরা পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। এইগুলি কোরআনের আয়াত কিনা এবং কোরআনের সূরা কিনা? তার মনে সন্দেহ আসেনি। উস্তাদকে এ মর্মে কোন প্রশ্ন করেন নি। এটাই তাকলীদে শখছী। যদি ছেলেটি কোরআন মজীদ শিক্ষা করার সময় উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করত, আপনি যে এটাকে 'আলীফ' বলছেন, এটা আলীফ কিনা অথবা আপনি যে আয়াত পড়ছেন এটা সঠিক আয়াত কিনা? যদি এই ধরণের সন্দেহ তার মনে আসতে থাকত এবং সে প্রশ্ন করতে থাকত, তাহলে তার কোন দিন কোরআন মজীদ শিক্ষা করা ভাগ্যে জুটতো না। তদ্রূপ কিছুদিন পর কোরআন মজীদের অর্থ যে উস্তাদ থেকে অর্জন করবে সেখানে যদি মনে মনে প্রশ্ন আসে, উক্ত আয়াতের অর্থ উস্তাদ যেটা বলছেন তা ঠিক না বেঠিক, শুদ্ধ না অশুদ্ধ তা

অন্যত্র যাচাই করে দেখব। এইভাবে প্রতিদিন তার মনে যদি এই ধরণের প্রশ্ন আসতে থাকে, তাহলে তার কোরআন মজীদের অর্থ শিক্ষা করা নসীব হবে না। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়লে যদি ইমামের উপর আস্থা না থাকে, সে যদি মনে মনে ধারণা করে এই ইমাম যে নামায পড়াচ্ছেন তা সঠিক হচ্ছে কিনা? তা আরেক ইমামের নিকট গিয়ে যাচাই করে দেখব। তাহলে এইভাবে সে যাচাই করতে থাকবে, আর তার কোন ইমামের পিছনে নামায পড়ার সুযোগ হবে না।

তেমনিভাবে যদি কেউ অযু-গোসল, নামায-রোযা এবং যাকাত ইত্যাদির মাসায়েল শিখার জন্য কোন উস্তাদের শরণাপন্ন হয়। অতঃপর উস্তাদ তাকে উপরোক্ত বিষয়ে মাসায়েল শিখাতে আরম্ভ করেন। তখন যদি ঐ ছাত্র উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করে, হুযুর উক্ত মাসায়েল কোথায় পেলেন, কোন্ কিতাব থেকে বলছেন। উস্তাদ যদি বলে অমুক কিতাব থেকে বলছি। ঐ ছাত্র যদি বলে, আপনি যে কিতাবের কথা বলছেন ঐ কিতাবে ঐ সমস্ত মাসায়েল আছে কিনা? আর যদি থাকে তা সঠিক আছে কিনা তা আমি যাচাই করে দেখব। এইভাবে ছাত্র যদি যাচাইয়ের পথ অবলম্বন করে তাহলে তার কপালে ইলম জুটবে না।

মোদ্দাকথা, ইসলামের প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক আমল এক ব্যক্তির উপর আস্থা রেখে শিখতে হবে, করতে হবে। আস্থাহীন ব্যক্তির জন্য কোরআন শিক্ষা করা, নামায পড়া ও মাসায়েল শিক্ষা করা তথা দ্বীন শিক্ষা করা কখনো সম্ভব নয়। এ.ডি.সি সাহেব ও এই ধরণের প্রশ্নকারী ভদ্রলোকদের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হবে এটা।

ইমামে আ'যম আবু হানীফা রহ.এর অবদান

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর উপর কোরআন নাযিল হয়েছে। কোরআনের মধ্যে অযু, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের হুকুম নাযিল হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম সেগুলি কিভাবে আদায় করবে তার বিস্তারিত পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, অযুর শুরুতে প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়বে। তারপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করবে। তারপর তিনবার কুলি করবে। তারপর তিনবার নাকে পানি দিবে। তারপর সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করবে। তারপর ডান হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করবে। তারপর বাম হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করবে। তারপর মাথা মাছেহ্ করবে। তারপর ডান পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করবে। তারপর বাম পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত

করবে। এইভাবে নামায কিভাবে আরম্ভ করবে, কিভাবে পড়বে, কিভাবে শেষ করবে, তার বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা, কোনটি সুন্নতে যায়েদা, কোনটি না করলে অযু হবে না, নামায হবে না, কোনটি আদায় না করলে মাকরুহে তাহরীমি হবে, মাকরুহে তানযীহি হবে। এইগুলি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেন নি।

ছাহাবায়ে কিরাম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমকে যেভাবে করতে দেখেছেন তারাও সেভাবে করেছেন। তারাও ঐগুলির ব্যাপারে তাফসীলি হুকুম বয়ান করেন নেই। আর কেউ কেউ কিছু বয়ান করলেও তা লিপিবদ্ধ হয় নেই। তদ্রূপ অনেক মুজতাহিদ, তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈন হযরাত কিছু কিছু বর্ণনা করলেও সর্ব ব্যাপারে তাদের লিখিত কিতাব পাওয়া যায় নেই। যা তাকলীদে শখছীর অধ্যায়ে লিখা হয়েছে।

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. ছিলেন তাবেঈ। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত ইজতেহাদী শক্তি, ঈমানী শক্তি, তাকওয়ার শক্তি ও রূহানী শক্তির মাধ্যমে কোরআন ও হাদীছ থেকে রিসার্চ করে আহ্কামের উসূল বা মূলনীতি লিখিয়েছিলেন। তারপর প্রত্যেক জিনিসের ব্যাপারে শরয়ী ফায়সালা দেয়ার জন্য চল্লিশজন মুজতাহিদ, মুহাদ্দিছ, আরবী ভাষাবিদ এবং প্রত্যেক ব্যাপারে বিজ্ঞ তাঁর শাগরিদদেরকে নিয়ে একটি ফতওয়া বোর্ড গঠন করেছিলেন। উক্ত বোর্ডের সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে দলীলসমূহের ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা করে প্রত্যেক দলীলের শক্তি মোতাবেক তার হুকুম চিহ্নিত করেন। যেমন, অকাট্য ও জ্বলন্ত (قطعي الثبوت، قطعي الدلالة) আয়াতসমূহের দ্বারা যে হুকুম সাব্যস্ত হতো তার নাম হচ্ছে ফরয। আর অকাট্য ও জ্বলন্ত (قطعي الثبوت، قطعي الدلالة) নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আয়াতের দ্বারা যে হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে তা হচ্ছে হারাম। এইভাবে তাঁর লিখার কাজ ১২০ হিজরী থেকে শুরু করে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত চালু থাকে। তাঁর উক্ত খেদমত দ্বারা ইবাদত মুয়ামালাত, মুআশারাত, সিয়াসত, বিচার বিভাগ ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারে আহকাম চিহ্নিত করে লিখা হয়। যেমন, অযুতে কয়টি ফরয, কয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও কয়টি সুন্নতে যায়দা, কয়টি মুস্তাহাব, কয় কারণে অযু ভেঙ্গে যায়, কয় কারণে অযু মাকরূহ হয় ইত্যাদি। তেমনিভাবে নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব এবং অন্যান্য ইবাদতের আহকাম, মোয়ামালত তথা সর্ব প্রকারের ব্যবসা-বানিজ্যের আহকাম,

মোআশারাত তথা সর্ব প্রকারের আচার-আচরণ এর আহকাম, সিয়াসত তথা সর্ব প্রকারের রাজনীতি ও বিচার বিভাগের আহকাম কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করে চতুর্দিকে মুসলিম সমাজে প্রচার-প্রসার করেন। পর্যায়ক্রমে আল্লাহ পাকের ফযল ও করমে এই সকল কিতাব সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এ কারণেই ইমাম শাফে'ঈ রহ. বলেছেন

الناس عيال علي أبي حنيفة – رحمه الله – في الفقه

"ইলমে ফিকহ তথা শরয়ী আহকাম ও মাসায়েল জানার ক্ষেত্রে সবমানুষ ইমাম আবু হানীফ রহ. এর পরিবারভুক্ত অর্থাৎ তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী।

ইমাম বোখারীর রহ.-এর উস্তাদের উস্তাদআমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. ইমাম আযম আবু হানীফ রহ. সম্পর্কে কতইনা চমৎকার বলেছেন,

لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا ❋ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو حَنِيفَهْ

بِأَحْكَامٍ وَآثَارٍ وَفِقْهٍ ❋ كَآيَاتِ الزَّبُورِ عَلَى صَحِيفَهْ

فَمَا فِي الْمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ ❋ وَلَا فِي الْمَغْرِبَيْنِ وَلَا بِكُوفَهْ

رَأَيْت الْعَائِبِينَ لَهُ سَفَاهًا ❋ خِلَافَ الْحَقِّ مَعَ حِجَجٍ ضَعِيفَهْ

অর্থাৎ"নিঃসন্দেহে ইমামুল মুসলিমীন আবু হানীফা রহ. শহরসমূহ ও শহরের অধিবাসীদের শোভামণ্ডিত করেছেন এমন শরী'আতের বিধি-বিধান, হাদীছ ও ফিকহ দ্বারা যা যবুরের আয়াতের ন্যায় ছহীফায় চমকায়। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, না কূফায়, না পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে, না পশ্চিম প্রান্তে। আমি তাঁর বিরোধীদের পেয়েছি নির্বোধ ও বোকা, যারা দুর্বল দালীল-প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে সত্যের বিরুদ্ধে। (রদ্দুল মুহতার,খ.১,পৃ. ১৪৭,আল- মাকতাবতুশ শামেলা)

ইতিহাস সাক্ষী, যখন থেকে মুসলমানরা ভারতে এসেছেন হানাফী মাযহাবের কিতাব হাতে নিয়ে এসেছেন। এ কারণেই অল ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বরং চীন ও বার্মার (মায়ানমার) প্রত্যেক মুসলিম অঞ্চলে প্রত্যেক মকতব ও মাদরাসাতে তথা ছোট বড় প্রত্যেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহের মাধ্যমেই যাবতীয় দ্বীনের আহকাম ও মাসায়েল শিক্ষা দেয়া হতো। উপরে হাওলাসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, সারা ভারতে একমাত্র হানাফী মুহাদ্দিছগণই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীছের খিদমত

আঞ্জাম দিয়েছেন। সারা ভারতের মুসলমানরা তাদের থেকে ইলমে হাদীছ পেয়েছেন। আহলে হাদীছের ইমাম মাও. নযীর হোসাইন সাহেব দেহ্লবী নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী ইলমে হাদীছ নিয়েছেন উস্তাদুল আসাতেযা হযরত শাহ ইসহাক সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী হানাফী থেকে।

মোদ্দাকথা, ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলের যে কোন মুসলমান যদি তার উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে যে মাসআলা বা আহকাম বা যে হাদীছ শিক্ষা দিলেন তা কোথায় পেলেন? তিনি বলবেন, অমুকের কাছ থেকে পেয়েছি। অমুক কোথা থেকে পেলেন? তিনি বলবেন, অন্য আরেকজন থেকে পেয়েছেন। এইভাবে জিজ্ঞাসা করতে করতে সর্বপ্রকারের দ্বীনি ইলমের সনদ ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত পৌঁছবে। তাঁর উসিলায় তথা তাঁর শত শত যোগ্য শাগরেদদের মাধ্যমে সারা বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় মুসলমানরা দ্বীন পেয়েছেন। এইভাবে ছিল সারা বিশ্বের অধিকাংশ এলাকার বিশেষ করে ভারত বর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলের দ্বীন শিখার ধারাবাহিকতা। কিন্তু ১২৪০ হি. পরে আব্দুল হক বেনারসী ও আরো কিছু ধোঁকাবাজ গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাতের আন্দোলনের নামে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। উক্ত আলোচনার দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিরা অতি সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন, ইমাম আবু হানিফার নাম কোথা থেকে এলো। সারকথা হচ্ছে, মুসলমানদেরকে চার ইমামের যে কোন ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব। কিন্তু সারা ভারতের মুসলমানদেরকে এবং যে সকল দেশ ও অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের কিতাবের মাধ্যমে দ্বীন পৌঁছেছে তাদের জন্য হানাফী মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানীফা রহ.কে কটূক্তি করার করুণ পরিণতি

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর মর্যাদা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও বাদুড়ের ন্যায় কিছু বদনছীব আহলে হাদীছ নামধারী তাঁর শানে বিভিন্ন কটূক্তি করে থাকে। এধরণের একটি কটূক্তির করুণ পরিণতীর ঘটনা শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.: স্মারক গ্রন্থ' থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ করা সমীচিন মনে করছি।

ঘটনাটির বিবরণ এই, অমৃতসর অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম 'তীলিয়াঁ'। এর অধিবাসীদের সিংহভাগ আহলে হাদীছ। সেখানে আব্দুল আলী নামক একজন মৌলভী ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করত। সে পড়ালেখা করত 'মাদরাসায়ে গযনবিয়া'য় মাওলানা আব্দুল জব্বার গযনবীর কাছে। একবার

মৌলভী আব্দুল আলী বলল, আবু হানীফার চেয়ে আমিই ভালো ও বড়। কারণ, তার মাত্র সতেরটি হাদীছ মুখস্থ ছিল, আর আমার তো এর চেয়ে কয়েকগুন বেশী হাদীছ মুখস্থ আছে। (নাউযুবিল্লাহ) তার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাটি মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেবের কানে পৌঁছল। তিনি বুজুর্গদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কথাটি শোনার পর তার চেহারা মোবারক রাগে-ক্ষোভে লাল হয়ে গেলো। তিনি নির্দেশ দিলেন, এ কমবখ্ত হতভাগা (আব্দুল আলি)-কে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করে দাও। যখন তাকে বের করে দেওয়া হলো, মাওলানা আব্দুল জব্বার গাযনবী বললেন, আমার মনে হয় এই লোকটি অচিরেই মুরতাদ হয়ে যাবে। মুফতী মুহাম্মাদ হাসান বলেন, এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই এলোকটি কাদিয়ানী হয়ে গেলো এবং এলাকার লোকেরা তাকে লাঞ্ছিত করে মাসজিদ থেকে বের করে দিল। এ ঘটনার পর কেউ মাওলানাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিভাবে বুঝলেন যে, অচিরেই সে কাফির হয়ে যাবে? তিনি বললেন, যে মুহূর্তে আমার কাছে তার ধৃষ্টতার সংবাদ পৌঁছে, তখন বুখারী শরীফের এই হাদীছটি আমার মনে ভেসে ওঠে। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

অর্থাৎ যে আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করি" আমাদের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন আল্লাহর ওলী ও বন্ধু। যুদ্ধে উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষের সর্বোত্তম বস্তুটিই ছিনিয়ে নেয়। অতএব, আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেল তখণ এমন ব্যক্তির কাছে (সর্বোত্তম সম্পদ) ঈমান থাকার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

(দাউদ গযনবী পৃ.১৯১,১৯২;স্মারকগ্রন্থ,পৃ.৭৭)

এক হানফী মাওলানার প্রশ্নে এক আহলে হাদীছ আলেম লা-জবাব

জনাব মাও. মুনির আহমদ মুলতানী দা.বা. এক আহলে হাদীছ মাওলানাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আপনি হাদীছের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন। তিনি উত্তরে বললেন, হাদীছ বলা হয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর কাওল, ফেয়েল ও তাকরীরকে অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে। আমি (মাও. মুনীর আহমদ) তাকে বললাম, হাদীছের যে সংজ্ঞা আপনি বর্ণনা করেছেন তা কোরআন মাজীদের কোন

আয়াত বা হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করুন। তিনি বললেন, এই ধরণের কোন আয়াত অথবা হাদীছ নেই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি হাদীছের সংজ্ঞা কিভাবে বয়ান করলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, মুহাদ্দিছীনে কেরাম হাদীছের সংজ্ঞা এইভাবে বয়ান করেছেন। তাই আমি এভাবে বর্ণনা করলাম। তখন আমি বললাম, হাদীছের সংজ্ঞা বয়ান করতে আপনি মুহাদ্দিছীনে কিরামের তাকলীদ করলেন। এখন আপনি এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করুন যে হাদীছের মধ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বর্ণনা করেছেন, ফকীহ এবং মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা শিরক। আর মুহাদ্দিছীনের তাকলীদ করা শিরক নয়। তিনি বললেন, এই ধরণের কোন হাদীছ নেই। তখন আমি বললাম, যদি এই ধরণের কোন হাদীছ না থাকে, তাহলে নিশ্চয় আপনি হাদীছের উক্ত সংজ্ঞা বর্ণনা করতে মুহাদ্দিছীনের তাকলীদ করেছেন। যেহেতু আপনাদের মতে তাকলীদ হল শিরক, অতএব আপনি উক্ত শিরক থেকে তাওবা করতে হবে এবং আপনি পুনরায় আপনার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। মুশরিক হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার বৈবাহিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর ঐ ব্যক্তি কোন উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। বরং চুপ হয়ে গেছে। (হাওলাঃ বারা মাসায়েল ২০ লাখ এনআম নামক কিতাব পৃষ্ঠা-১৫)

তথাকথিত আহলে হাদীছের প্রতি কতিপয় প্রশ্নঃ

মাযহাব অনুসারী ভাইদের প্রতি আমার আরয, আপনারা আমাদের দেশের তথাকথিত আহলে হাদীছ ভাইদেরকে যেখানে পাবেন, সেখানে হযরত মাও. মনির আহমদ সাহেবের উক্ত প্রশ্নসহ নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন। প্রথম সাক্ষাতে সালামের পর এই মর্মে কালাম আরম্ভ করবেন। ভাই! সালাম প্রদান করা সুন্নত না ওয়াজিব, না ফরয? যেটাই হোক কোন আয়াত দ্বারা অথবা কোন হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এই উত্তর আপনাদের দিতে হবে।

অযুর পূর্বে অযুরঘাটে বা হাউযে সাক্ষাৎ হলে তাদের প্রশ্ন করবেন, ভাই! অযুতে কয়টি ফরয ও কি কি? কয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও কি কি? কয়টি সুন্নতে যায়দা ও কি কি? তা কোন আয়াত ও কোন স্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা বয়ান করে শুনান।

তদ্রূপ মসজিদে ঢুকতে তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, কোন্ পা দিয়ে মসজিদে ঢুকছেন। যদি বলে ডান পা দিয়ে ঢুকছি। তখন জিজ্ঞাসা করবেন, ডান পা দিয়ে মসজিদে ঢুকা ফরয, না ওয়াজিব না সুন্নত। আর মসজিদে ঢুকতে কোন

দু'আ পড়লেন, ঐ দু'আ পড়াটা ফরয না ওয়াজিব না সুন্নত, তা কোরআনের কোন আয়াত বা স্পষ্ট কোন সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বলুন ?

নামায পড়তে মসজিদে গেলে তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, নামাযে কয়টি ফরয ও কি কি? কয়টি ওয়াজিব ও কি কি? কয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও কি কি? কয়টি সুন্নতে যায়দা ও কি কি? তা কোরআনে কারীমের কোন আয়াত বা কোন স্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা বয়ান করুন?

এইভাবে বাজারে ঢুকার সময় আহলে হাদীছ ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনি বাজারে ঢুকতে কোন দু'আ পড়লেন। যদি বলে এই দু'আ পড়লাম। তখন জিজ্ঞাসা করবেন, এই দু'আ পড়া ফরয না ওয়াজিব না সুন্নত, তা কোরআনের কোন আয়াত বা কোন স্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা বর্ণনা করে শুনান।

তদ্রূপ শরীরে রক্ত, কিডনি, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গ একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে দানের মাধ্যমে বা বিক্রয়ের মাধ্যমে পুশি ইন করা, সংযোজন করা জায়েয না হারাম। তা কোরআনের কোন স্পষ্ট আয়াত বা কোন স্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা বর্ণনা করে শুনান।

অনুরূপভাবে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, বর্তমান যুগের শেয়ার ও এমএলএম ব্যবসা, ফ্ল্যাট, তদ্রূপ সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা ইত্যাদি জায়েয না হারাম যেটা হোক কোরআনের স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা তা সাব্যস্ত করে শুনান।

বর্তমানে ব্যাংকিং সিস্টেম জায়েয না নাজায়েয, তা কোরআনে কারীমের কোন স্পষ্ট আয়াত বা কোন স্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত করুন।
বর্তমান প্রচলিত বীমা ও ব্যাংকিং সিস্টেম ইত্যাদি যদি নাজায়েয হয় তাহলে ঐগুলো জায়েয হওয়ার বিকল্প পদ্ধতিটা কোরআনের কোন স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত করুন। যাতে কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদী রায় বা মুফতির রায় না থাকে। অর্থাৎ কোরআন-হাদীছ ছাড়া অন্যের তাকলীদ না থাকে।

মোদ্দাকথা, মাযহাব অনুসরণকারী ভাইগণ তথাকথিত আহলে হাদীছ ভাইদেরকে যারা বলে, ইজতেহাদ নাজায়েয, তাকলীদ শিরক, বেদ'আত ইত্যাদি। কেয়াস শয়তানী কাজ, আমরা কোরআন ও হাদীছ অনুযারী আমল করি। মাযহাব আমরা মানি না। তাদেরকে অযু করতে হাটে-বাজারে, ঘাটে মসজিদে এবং যেখানে সাক্ষাৎ হয় উল্লিখিত প্রশ্নগুলি করতে থাকবেন। কখনও

তারা উত্তর দিতে পারবে না। কারণ, শরী'আতের কোন হুকুম ফরয বা ওয়াজিব বা সুন্নতে মুয়াক্কদা বা সুন্নতে যায়দা। অপর দিকে ব্যবসা-বানিজ্য বা চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে কোন নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি বা নব আবিস্কৃত বস্তু জায়েয বা হারাম বা মাকরুহে তাহরীমি বা মাকরুহে তানযীহি হওয়াটা কোরআন মজীদের কোন স্পষ্ট আয়াতের দ্বারা বা স্পষ্ট হাদীছের দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত নেই। এইগুলি একমাত্র মুজতাহিদীনে কিরামের ইজতেহাদেরই অবদান। তাঁরা কোরআন ও হাদীছের আলোকে ইজতেহাদ করে সাব্যস্ত করেছেন অযুতে কয়টি ফরয ও কি কি। কয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও কি কি? কয়টি সুন্নতে যায়দা ও কি কি? তদ্রূপ নামাযে ফরয কয়টি ও কি কি? ওয়াজিব কয়টি ও কি কি? সুন্নতে মুয়াক্কাদা কয়টি ও কি কি? সুন্নতে যায়দা কয়টি ও কি কি? তা মুজতাহিদীনে কিরামগণ কোরআন ও হাদীছের আলোকে ইজতেহাদ করে ঐসব নীতি নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপ ব্যবসা-বানিজ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি নব আবিস্কৃত পদ্ধতি ও নব আবিস্কৃত বস্তুসমূহের জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদীনে কিরামের ইজতেহাদের আলোকে যুগের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম রায় প্রদান করে থাকেন।

প্রকৃত আহলে হাদীছ কারা?

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, কেবল মাত্র হাদীছ শোনা, লেখা অথবা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিদেরকেই আহলে হাদীছ বলা হয় না বরং প্রকৃত আহলে হাদীছ বলতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বুঝায়, যারা হাদীছ সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, যাহের ও বাতেন অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং যাহের ও বাতেন অর্থের অনুসারী হবে। (নাকদুল মানতিক পৃ. ১৮)

হাফেযে হাদীছ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (মৃ.৮২০) লিখেন, এটা সর্বজনবিদিত যে, আহলে হাদীছ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি গুরুত্বসহকারে হাদীছের খেদমত করেছেন এবং এর অন্বেষণে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। (হাওলা: মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে পৃ.২৯)

উল্লেখিত বক্তব্য দু'টির আলোকে সুস্পষ্ট হয় যে, 'আহলে হাদীছ' হতে হলে হাদীছ সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। ফিক্‌হে হাদীছ তথা হাদীছের মর্মকথা অনুধাবণ করতে হবে। আর আমল করতে হবে সে অনুযায়ী। চাই যে যেই মাযহাবের অনুসারী হোক না কেন।

কিন্তু বর্তমানে আহলে হাদীছ বলতে এমন একটি দলকে বুঝায়, যাদের ভিতর রয়েছে শত শত নিরক্ষর ব্যক্তি এবং অনেক সাধারণ শিক্ষিত। আর অনেক মৌলভী যাদের সাথে হাদীছের দরস-তদরীসের তথা হাদীছের শিক্ষা আদান-প্রদানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আবার এটি এমন একটি দল, যাদের আক্বীদা হল, মাযহাব মানা শিরক বা বিদআত ও হারাম। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত গাইরে মুকাল্লিদ দলটি ১২০০ হিজরীর শেষভাগে বৃটিশ সরকারের দপ্তর থেকে অনুমোদন নিয়ে নিজেদেরকে আহলে হাদীছ নামে নামকরণ করেছে। লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

তদুপরি আহলে হাদীছ বলার কারণে কোরআন বাদ পড়ে গেল অর্থাৎ কোরআন তাদের প্রয়োজন নেই। তাঁরা শুধু হাদীছের উপর আমল করবে। তাদের আগে বা পরে হিন্দুস্তানে আরেকটি দল প্রকাশ হয়ে ছিল। তাদের নাম ছিল আহলে কোরআন। তারা ছিল মুনকিরে হাদীছ অর্থাৎ হাদীছের অস্বীকারকারী। উভয় নাম হাদীছ বিরোধী এবং উভয় দল ভণ্ড দল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে ছিলেনঃ

ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنۃ رسولہ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে আমি এমন বৃহত্তম দুইটি জিনিস রেখে গেলাম, যে দুইটিকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর সুন্নত বা তরীকা।

উল্লিখিত দুই দলের একদলে কিতাবুল্লাহ নেই। অন্য দলের সুন্নতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম নেই। তাই উভয় দল গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

প্রত্যেক মুসলমানকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ومن یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوابہا وعضوا علیہا بالنواجذ الخ

সারকথা, উক্ত সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, উম্মতের যে কোন মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর তরীকা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা অবলম্বন

করতে হবে। তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেছেন, বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামী। আর একদল হবে জান্নাতী। ছাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতি দলটি কারা? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেছেন, যে দল আমার তরীকা এবং আমার ছাহাবায়ে কিরামের তরীকা মতে জীবন গঠন করবে। তারাই হবে বেহশতী। মুসনাদে আহমদ এবং আবু দাঊদ শরীফে আছে هى الجماعة অর্থাৎ ঐ দলটি হল, আমার ছাহাবায়ে কিরামের জামাত। সুনানে তিরমিযি মুকনায ১৩৮/১০ আছে, ইমাম তিরমিযি রহ. বলেছেন, এটা হাদীছে হাসান। আর শাইখ আলবানীও এই হাদীছকে হাদীছে হাসান বলেছেন।

উপরে উল্লেখিত সহীহ্ হাদীছের দ্বারা উম্মতকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর সুন্নত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে অনুকরণ করার জন্য হুকুম করা হয়েছে। আর এই হাদীছে বলা হয়েছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এবং তার ছাহাবীদের অনুকরণকারী জামাত হল জান্নাতী জামাত। প্রথম হাদীছে পেলাম সুন্নতের অনুকরণ। আর দ্বিতীয় হাদীছে পেলাম জামাতে ছাহাবায়ে কিরামের অনুকরণ। তাই সমস্ত মুসলমানদেরকে হতে হবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তথা সুন্নতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণকারী ও ছাহাবীদের জামাতের অনুকরণকারী। তাছাড়া খাইরুল কুরূনের (সহীহ্) হাদীছে ছাহাবায়ে কিরাম রা. কে যেহেতু উত্তম উম্মতের উপাধি প্রদান করা হয়েছে। তাই পরবর্তী উম্মতের জন্য তাদেরই অনুকরণ করা অপরিহার্য ব্যাপার। উল্লেখিত হাদীছসমূহের কারণেই তাবেঈন, তাবে'তাবেঈন রহ.তথা ইসলামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্ণযুগের মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ ইসলামের আক্বীদা ও আমলসমূহের ব্যাপারে অক্ষরে অক্ষরে সুন্নতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ও সুন্নতে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ছাহাবায়ে কিরামের ইজমাঈ আমলসমূহের উপর আমল করেছেন। তা শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঐগুলির রেওয়ায়েত করেছেন। তারপর চার মাযহাবের ইমামগণ ঐগুলিকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে কিতাব আকারে সারা বিশ্বে প্রচার করেন। যারা তাদের অনুকরণ করেন, তারাই হলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। আর আল্লাহ পাকের কুদরতী নিযামে তাদের নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তি অথবা দলের তাদবীর ব্যতীত যেভাবে তারা চার মাযহাবের ইমাম

হিসাবে সারা দুনিয়ার সামনে প্রসিদ্ধ হয়ে যান, তদ্রূপ তারা সারা বিশ্বের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমাম হিসেবেও সাব্যস্ত হন। এটা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই ফযল ও করম। এ ব্যাপারে কোন বান্দার হাত নেই। কোটি কোটি মুসলমান তাদের লিখিত বা তাদের হুকুমে লিখিত কিতাবসমূহের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

অপর দিকে শিয়া, খারেজী, রাফেজী, মু'তাজেলী এবং গাইরে মুকাল্লিদরা হিংসার আগুনে জ্বলছে এবং বাদুড়ের ন্যায় তাদের বিরোধীতা করছে। তাই সর্বস্তরের মুসলমান ভাই বোনদের প্রতি আমার আকুল আবেদন হল, তারা যেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের তথা চার মাযহাব থেকে যে কোন মাযহাবের অনুকরণ অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করেন। শিয়া, রাফেজী, খারেজী ও গাইরে মুকাল্লিদদের প্রতারণায় পড়ে গুমরাহীর কূপ হাবুডুবু না খান।

পরিশেষে আমি দো'আ করছি আল্লাহ পাক দয়া করে সারা বিশ্বের তথাকথিত আহলে হাদীছ ভাই বোনদেরকে তাওবা করে উল্লেখিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বর্তমান বিশ্বের গোমরাহির সেরা নায়ক ডা. জাকির নায়েক

পূর্বে সহীহ্ হাদীছসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, এ উম্মতের হক জামাতের নাম হল, **আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত**। ঐ জামাতের বিরুদ্ধে কথায়, কাজে, কলমে বিরোধিতা করে আসছে গোমরাহ ও প্রকাশ্য কোরআন-হাদীছ বিরোধী দল- শিয়া, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযেলা, বেদআতী ও গায়রে মুকাল্লিদরা। কিছু দিনের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম মিডিয়ার মাধ্যমে এবং লোকজনের মুখে মুখে ব্যাপকভাবে প্রচার হচ্ছে। যার নাম হচ্ছে ডা. জাকির নায়েক। কিন্তু যুগের অনেক মুহাক্কিক আলেমের তাহকীক অনুযায়ী তার 'লেকচার সমগ্র' এর ভলিউমসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে পূর্বের সমস্ত গোমরাহ দলের সমন্বয়কারী এক গোমরাহ ব্যক্তি। তার অনেক লেকচার দ্বারা বুঝা যায় যে, সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য সে বিজাতিদের ও অনেক পথভ্রষ্ট দলের পক্ষ থেকে একজন মনোনীত ব্যক্তি। তাই দ্বীনি দায়িত্ব পালনার্থে তার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে হয়। কারণ, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من رآى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان. (مسلم)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শরী'আতবিরোধী কোন কাজ দেখলে হাত দ্বারা তথা পূর্ণশক্তি দ্বারা তা সংশোধন করে দিবে। পূর্ণশক্তি যদি না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা বলে সংশোধন করে দিবে। তা সম্ভব না হলে, অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে (সংশোধনের ফিকির ও পরিকল্পনা করবে)। এটা হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্নস্তর। [মুসলিম শরীফ]

তাই মুখের দ্বারা ডা. জাকির নায়েকের গোমরাহীর ব্যাপারে যতটুকু সম্ভব মানুষকে বলে দেয়া এবং লিখার মাধ্যমে মানুষকে অবহিত করা নিজের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করছি। উদাহরণস্বরূপ মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্য তার লেকচার সমগ্র হতে গোমরাহীর কতিপয় ভ্রান্ত আকিদা উল্লেখ করা হচ্ছে।

ডা. জাকির নায়েক বলেন, আল্লাহর কোরআনে ভুল আছে।

জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিত ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এর একটি অভিযোগের উদ্বৃতি টেনে ডা. জাকির নায়েক কোরআনে ভুল হয়েছে বলে মেনে নেন। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, কোরআনে রয়েছে নূহ আ. এর জাতি রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে, নূহ আ. এর জাতির নিকট একজনমাত্র নবীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং এটি (পবিত্র কোরআনের) একটি ব্যাকরণগত ভুল। কোরআনে বলা উচিত ছিল, নূহ আ. এর জাতির লোকেরা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ডা. জাকির নায়েক বলেন, আমি আপনাদের সাথে একমত যে, কোরআনে এটা ভুল হতে পারে।

(ভলিউম নং- ১, পৃ.৫১)

অথচ তাফসীরবিদগণ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল বা নবীকে প্রত্যাখ্যান করা ও অস্বীকার করা সমস্ত রাসূল বা নবীকে প্রত্যাখ্যান করা ও অস্বীকার করার সমতুল্য। কারণ, সকলের দাওয়াতের মূল এবং ত্বরীকা এক। যেমন, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন [মুফতি শফি রহ. রচিত], তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন [ইদ্রিস কান্দলবী রচিত] ইত্যাদি তাফসীরের কিতাবে আছে।

তাফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত নকল করা হয়েছে, সাইয়িদুত তাবেঈন হযরত হাসান বসরী রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কওমে নূহ এর জন্য একজন পয়গাম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন। তদ্রূপ কওমে আ'দের জন্য একজন পয়গাম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন। তেমনিভাবে কওমে সামুদের জন্যও একজন পয়গাম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন। অথচ কোরআনে বলা হয়েছে,

كذبت قوم نوح المرسلين- كذبت عاد المرسلين- كذبت ثمود المرسلين-

অর্থাৎ নুহ (আ.) এর জাতি রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কওমে আ'দ রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কওমে সামুদ রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উল্লেখিত প্রত্যেক জাতির নিকট একজন একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করা হয়েছিল। তারপরও কোরআনে পাকে বলা হয়েছে, প্রত্যেক কওম রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ দরকার ছিল একবচন উল্লেখ করা। তার পরিবর্তে বহুবচন কেন উল্লেখ করলেন? হাসান বসরী রহ. তার উত্তরে

বলেছেন, এক পয়গাম্বর যে তাওহীদ ও আকায়েদের দা'ওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে এসেছেন অন্যান্য সমস্ত পয়গাম্বরও ঐ তাওহীদ ও আকায়েদের দা'ওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে এসেছেন। তাই এক পয়গাম্বরকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা সকলকে প্রত্যাখ্যান করার সমতুল্য। এজন্য উল্লেখিত আয়াতসমূহে 'রাসূল' না বলে 'মুরসালীন' বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ডা. জাকির নায়েক মুফাস্‌সিরীনে কিরামের উক্ত সঠিক ও সরল উত্তর গ্রহণ না করে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল খ্রিস্টানের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন, ঐ ব্যাপারে কোরআনে ভুল হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। অথচ আল্লাহপাক কোরআন মজীদের প্রথমেই ঘোষণা দিয়েছেন, ذالك الكتاب لا ريب فيه অর্থাৎ কোরআনে পাকের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তথা কোন প্রকারের ভুল নেই। খ্রিস্টানের ইঙ্গিতে ডা. জাকির নায়েক কোরআনে ভুল আছে বলে মন্তব্য করে সারা বিশ্বের সামনে একথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কোরআনে পাক ভুলমুক্ত নয়। অথচ উক্ত মন্তব্য কোন ঈমানদারের হতে পারে না। বরং বেঈমান ছাড়া এ মন্তব্য কেউ করতে পারে না।

অযু ও পবিত্রতা ব্যতীত কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হাযেম রা.কে ইয়ামানে পাঠানোর পর তাঁর নিকট শরী'আতের বিভিন্ন আহকামসম্বলিত পত্র লিখেন। তন্মধ্যে এটাও ছিল,

لا يمس القرآن إلا طاهر

অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত তথা কোন অপবিত্র ব্যক্তি কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না। উক্ত হাদীছটি ইমাম মালেক রহ. তাঁর লিখিত কিতাব 'মুয়াত্তা'র মধ্যে রেওয়ায়েত করেছেন এবং তাফসীরে রূহুল মা'আনী উক্ত হাদীছটি মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক, মুসনাদে ইবনে আবী দাউদ, মুসনাদে ইবনে মানযার হতে নকল করেছেন।

অনুরূপ ইমাম ত্বাবরানী এবং ইবনে মারদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে উক্ত হাদীছটি নকল করেছেন। উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে সমস্ত ছাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং চার মাযহাবের ইমামগণ তথা

উম্মতের উল্লেখযোগ্য আহলে ইলমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, অপবিত্র ব্যক্তি জুযদান ইত্যাদি ছাড়া সরাসরি কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না।

উক্ত মাসআলার ব্যাপারে ইসলামের প্রথম তিন স্বর্ণযুগের মহামনীষীদের এবং চার মাযহাবের ইমামগণের উল্লিখিত ঐক্যবদ্ধ রায়ের পর যদি কোন মুহাদ্দিস বা মুজতাহিদও তাদের বিপরীত রায় কায়েম করে থাকেন, তাহলে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ডা. জাকির নায়েকের মত বেইলম লোকের রায় গ্রহণযোগ্য হওয়ার তো কোন অবকাশই নেই।

মোদ্দাকথা, অপবিত্র ও বেঅযু ব্যক্তি কোরআন মজীদ স্পর্শ করতে পারবে না এ ব্যাপারে ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও চার মাযহাবের ইমামদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। হ্যাঁ মতানৈক্য আছে, لايمسه إلا المطهرون

এ আয়াতের ব্যাখ্যায়। কোন কোন ছাহাবা ও তাবেঈন হযরাত উক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেছেন, লাওহে মাহফুযের কোরআন পবিত্র ব্যক্তিগণ তথা ফেরেশতাগণ ব্যতীত অন্য কোন মাখলুক স্পর্শ করতে পারবে না বা অবগত হতে পারবে না।

আর কোন কোন ছাহাবা ও তাবেঈন হযরাত বলেন, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদের হাতে যে লিপিবদ্ধ কপি আছে, পবিত্র ব্যক্তিরা ব্যতীত তা কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তাফসীরে মাযহারী ইত্যাদিতে এ তাফসীরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ, ফারূকে আযম হযরত উমর রা. তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাতে তাঁর বোন থেকে কোরআন মজীদের লিখিত কপি পড়ার জন্য চেয়েছিলেন। বোন এ বলে তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহ পাক কোরআন মজীদে বলেছেন,

لايمسه إلا المطهرون

অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি কোরআন মজীদ স্পর্শ করতে পারবে না। যেহেতু আপনি অপবিত্র, গোসল ছাড়া কোরআন মজীদ স্পর্শ করতে পারবেন না। এ তাফসীর অনুযায়ী উক্ত আয়াতে শরী'আতের একটি নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, অপবিত্র ব্যক্তিরা কোরআন স্পর্শ করতে শারীরিক ক্ষমতা রাখে না। যেমন, কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর ব্যাপারে যদি বলে, অমুক অমুক জিনিস খেতে পারবে না। এটা হলো ডাক্তারী বিধান মোতাবেক নিষেধাজ্ঞা। তার অর্থ এই নয় যে, উক্ত নিষিদ্ধ জিনিসগুলো

ঐ রোগী হাতে ধরার ও খাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এ অর্থ বোকা ব্যক্তি ছাড়া কেউ বলবে না।

ডা. জাকির নায়েক রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত সহীহ্ হাদীছটি উপেক্ষা করছেন,

لا يمس القران إلاطاهر

অর্থাৎ কোরআন মজীদকে পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত তথা অপবিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারবে না। সমস্ত ছাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও চার মাযহাবের ইমামগণের ঐক্যবদ্ধ রায়কে উপেক্ষা করে নিজের ভ্রান্ত ও গোমরাহ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, কোরআন মজীদ অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয হবে। তিনি বোকা ব্যক্তির ন্যায় আরও একটি হাস্যকর যুক্তি পেশ করলেন যে, "আমরা যদি এটাকে আমাদের এ দুনিয়ার কোরআনের ব্যাপারে বলি, তাহলে যে কেউ মার্কেট থেকে ৮০/১০০ টাকার কোরআন শরীফ কিনে নিয়ে বলবে যে, কোরআন মিথ্যা। কেননা কোরআনে বলা হয়েছে যে, পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যতীত কেউ এটা স্পর্শ করতে পারবে না। অথচ আমি অপবিত্র হয়েও এটা স্পর্শ করতে পারলাম।" (ভলিউম নং-২, পৃ.৬২৬)

কারণ, তিনি শরী'আতের নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত কানুনকে শারীরিক অক্ষমতা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। যা একটা পরিপূর্ণ বোকা এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য ছাড়া কিছুই নয়।

মাযহাব ও মাযহাবের ইমামদের ব্যাপারে কটূক্তি

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মুজতাহিদ বিচারক যদি ইজতেহাদ করে ফয়সালা দেন এবং তাঁর ইজতেহাদ যদি নির্ভুল হয়, তাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দেয়া হবে। আর যদি ভুল হয় তাকে একগুণ সাওয়াব দেয়া হবে। অর্থাৎ মুজতাহিদ ইজতেহাদ করে ভুল করলেও তা দোষণীয় নয় বরং সর্বাবস্থায় মুজতাহিদ প্রশংসার যোগ্য। অথচ ডা. জাকির নায়েক তাঁর লেকচারে বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. ভুল করেছেন, ইমাম মালেক রহ. ভুল করেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.ও ভুল করেছেন। (ভলিউম নং-৫, পৃ.৯২১)

ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবের ইমামগণ ও মুজতাহিদগণ ভুল করেছেন বলে প্রচার করে উল্লিখিত হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন এবং তা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি গোমরাহ দল গাইরে মুকাল্লিদের এজেন্ট সেজে সারা বিশ্বের

মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া তিনি ইমাম ও মুজতাহিদগণের শানে বেয়াদবি করে নিজেকে চরম গোস্তাখ ব্যক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ডা. জাকির নায়েকের লেকচারসমূহের মধ্যে তার অনেক জঘন্য ভ্রান্ত মত রয়েছে। নমুনাস্বরূপ উল্লিখিত তিনটি মত লিখা হল। উপরে উল্লেখিত প্রথম দুই ভ্রান্ত মতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার জন্য বিজাতিদের পক্ষ থেকে একজন মনোনীত ব্যক্তি। তৃতীয় ভ্রান্ত মতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সারা বিশ্বের গোমরাহ দল শিয়া, রাফেযী, খারেজী, মু'তাজেলা, গায়রে মুকাল্লিদদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই সমস্ত বিবেকবান মুসলমান ভাই-বোনদেরকে ইন্টারনেটে, টেলিভিশনে বই-পুস্তকে বা যেকোন মাধ্যমে ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র দেখা ও পড়া থেকে সতর্কতামূলকভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

(বরাত : ডা. জাকির নায়েকের মতবাদ ও শরয়ী বিধান : মোহাম্মদ ইসমাঈল খান, মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ : মুনিরুল ইসলাম)

মাসিক ইছলাহী জোড়

স্থান : জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল, ফেনী।

তারিখ : প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ শুক্রবার

সময় : বা'দে আছর হতে ইশা পর্যন্ত

ইছলাহী বয়ান করবেন-

আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেব দা.বা.

হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর
পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। বর্তমানে চলছে ইসলাম ও মুসলমানদের বড়ই দুর্দিন। মুসলিম উম্মাহ আজ বহুমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলাম ও মুসলমানদের যারা দুশমন, তারাতো সর্বক্ষণ চাচ্ছে মুসলমাদের নিঃশেষ করে দিতে। আবার মুসলমানদের মাঝে অনেক বাতেল মত ও পথের অনুসারী দল রয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে। তাছাড়া মুসলমানদের চরিত্রে ও নৈতিকতায় নেমে এসেছে চরম অবক্ষয়।

আজ বড়ই প্রয়োজন হক্বপন্থীদের হক্বের দা'ওয়াত নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের। প্রয়োজন 'এসলাহে নফস' তথা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামবিরোধীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় যে পরিমাণ শ্রম দিচ্ছে, আমরা হক্বপন্থীরা যদি তার অর্ধেক শ্রমও দিতাম তাহলে বর্তমানে মুসলমানদের এই দুরবস্থা হতো না।

একথা অনস্বীকার্য যে, একা কারো পক্ষে দ্বীনের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। ব্যাপক খিদমতের জন্য প্রয়োজন মুখলিস ও সঙ্ঘবদ্ধ একটি জামাতের। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يد الله على الجماعة

অর্থাৎ, 'দলের উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে।'

রাহবারে শরী'আত ও তরীক্বত, জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল ফেনী-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শাইখুল হাদীছ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফতী, পীরে কামেল, হাকীমুল ওলামা, কুতুবে আলম আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ (দা.বা.)-এর খোলাফা, মুরীদান, ছাত্র ও মুহিব্বীনের রয়েছে এক বিশাল জামাত। যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্বীনের বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমের। সঙ্গে প্রয়োজন সুচিন্তিত কর্মসূচি, নিঃস্বার্থ দ্বীন প্রচারের স্পৃহা, উদ্যম ও তৎপরতা।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে দ্বীনের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ২/৫/১৪৩৩ হি. মোতাবেক ২৬/৩/২০১২ ইং তারিখে জামি'আ

ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল ফেনী-এর আসাতেযায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে হযরত মুফতী সাহেব হুযুরের উপাধি মোতাবেক **"হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ"** নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, **"হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ"** কোন নির্দিষ্ট জামাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত যারা ইসলামকে মনেপ্রাণে ভালবাসেন, যারা ইসলামের বহুল প্রচার-প্রসার কামনা করেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত করে নিজেকে ধন্য করতে চান, যারা আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে চান, তাছাড়া প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারী নবমুসলিমদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করে যারা মদীনার আনছারদের ভূমিকা পালন করে ধন্য হতে চান- ঐসমস্ত মুসলমানদের এই ফাউন্ডেশন। সকল খোদাপ্রেমিক দ্বীনদরদী মুসলমানদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এই ফাউন্ডেশনের সদস্য হতে এবং নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাদাকায়ে জারিয়ার নিয়তে এককালীন ও মাসিক অনুদান প্রদান করতে।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তাঁর দ্বীনের ব্যাপক খেদমতে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - এর
কর্মসূচীসমূহ

১. হযরতজীর লিখিত বই-পুস্তক, ফতওয়া ও বয়ান বই আকারে প্রকাশ করা।
২. সর্বস্তরের মুসলমানদের হেদায়াত ও ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাহী মাহ্ফিলের আয়োজন করা।
৩. যুগোপযোগী যে কোন বই ও দ্বীনি দা'ওয়াতি লিফলেট প্রচার করা।
৪. সাময়িক/ দ্বি-মাসিক/ মাসিক দ্বীনি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।
৫. বয়স্কদের কোরআন শিক্ষা দেয়া, নামায শুদ্ধ করা ও জরুরী মাসআলা মাসায়েল শিখানো।
৬. বিভিন্ন স্থানে কোরআনী মক্তব চালু করা।

৭. অসহায় এতিম, গরীব, দুঃখী ও নব মুসলিমদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করা।

৮. হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশনের অধীনে বিভিন্ন স্থানে **'সাঈদিয়া পাঠাগার'** প্রতিষ্ঠা করা।

উপর্যুক্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে নিজে ফাউন্ডেশনের সদস্য হোন, অন্যদেরকেও সদস্য বানিয়ে ছাওয়াবের ভাগী হোন এবং দ্বীনের ব্যাপক খেদমতে এগিয়ে আসুন।

যোগাযোগ

মাওলানা কারী কাসেম
সভাপতি
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ
০১৭১২২৩২১৯৫

মাওলানা সালমান
সেক্রেটারি
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ
০১৮১১৩১৩২৫১

প্রাপ্তিস্থান

জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া

লালপোল,ফেনী ।

মোস্তফা লাইব্রেরী

মিযান রোড ফেনী

এছাড়াও হযরতের খলীফাগণের নিকট পাওয়া যাবে।